ফোরাতের তীর

মফিজউদ্দিন খান

ফোরাতের তীর

পৃথিবীর—
সবচেয়ে শোকাবহ
ঘটনার
মর্মস্পর্শী
বিবরণ

ফোরাতের তীর

মফিজউদ্দিন খান

হাকিমাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেদিয়া
ভুঁইগড়, নারায়ণগঞ্জ।

কারবালার হৃদয় বিদারক কাহিনীর অশ্রুস্নাত বিবরণ–

ফোরাতের তীর

গ্রন্থকার
মফিজ উদ্দিন খান।

তৃতীয় সংস্করণ, সেপ্টেম্ব/১৯৯৫ ইং
চতুর্থ সংস্করণ, জুলাই/২০০৮ ইং

প্রচ্ছদ
আবদুর রৌউফ সরকার

প্রকাশক
হাকিমাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেদিয়া,
ভুঁইগড়, নারায়ণগঞ্জ

মুদ্রণ
শওকত প্রিন্টার্স,১৯০/বি,
ফকিরেরপুল, ঢাকা-১০০০।
মোবাঃ ০১৭১১-২৬৪৮৮৭, ০১৭১৫-৩০২৭৩১

বিনিময়ঃ সত্তর টাকা মাত্র।

FORATER TEER, a sacred life sketch of Hazrat Imam Hossain Ra. on the vision of Karbala tragedy written by Mofiz Uddin Khan in Bengalee and published by Hakimabad Khanka-e-Mozaddedia.

Exchange Taka Seventy only. U.S.$ 10.00

ISBN 984-70240-0039-0

সূর্য এখনো নামেনি অস্তে তবু রাত্রির মরণ ছাপ,
নেবে তক্‌দীরে আফতাব, নেবে মুজাহেদীনের প্রাণ প্রতাপ,
খিমার দুয়ারে আহাজারি ওঠে, কাঁদে শিশু-নারী-মরু তৃষায়
ভরে হাহাকারে সাত আস্‌মান অজানা রাতের ঘন ব্যাথায়!
হে বীর! এখন চলেছ একাকী সকল সংগী হারায়ে, হায়
আহত সিংহ, ক্ষত তনু তটে ঝ'রছে রক্ত শত ধারায়।

এ কোন্ ক্লান্তি ঘিরেছে তোমাকে হে দিলীর শের, সংগীহীন।
ফোরাতের তীরে নিভে যায় রবি শেষ হ'য়ে আসে রক্ত দিন!

ঝাঞ্জারা সিনা তবুও সিংহ জয় ক'রে নিল ফোরাত তীর,
আঁজলা ভরিয়া মুখে তুলে নিল ফোরাত নদীর শীতল নীর।
লাগলো আবার তীরের আঘাত পানি ফেলে দিয়ে দাঁড়ালো বীর
হাহাকার ক'রে উঠলো সভয়ে ফোরাত নদীর মুক্ত তীর।

তীব্র ব্যাথায় ঢেকে ফেলে মুখ দ্বিনের সূর্য অস্তাচলে,
ডোবে ইসলাম-রবি এজিদের আঘাতে অতল তিমির তলে,
কলিজা কাঁপায়ে কারবালা মাঠে ওঠে ক্রন্দন লোহু সফেন
ওঠে আসমান জমিনে মাতম; কাঁদে মানবতা ঃ হায় হোসেন।।

—ফররুখ আহমদ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রকৃত বিশ্বাসীরা সত্তাগতভাবেই প্রতিবাদী চরিত্রের অধিকারী হয়ে থাকেন। তাঁরা ভালো করেই জানেন যে, বিশ্বাসের বলয়ে প্রত্যেকের প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ। সন্দেহের অবস্থান বিশ্বাসের বিরুদ্ধ স্রোতে। ঐ বিরুদ্ধ স্রোতেই ভাসতে থাকে শয়তান ও প্রবৃত্তির পূজকেরা। খাঁটি তওবাই তাদের পরিত্রাণের একমাত্র প্রতিষেধক।

খাঁটি বিশ্বাসীদের দলের নাম আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত। সকল প্রকার স্খলন থেকে নিরাপদ এই জামাতের আকিদা বিশ্বাসকে অন্তরের একমাত্র বিশ্বাসে পরিণত না করা পর্যন্ত ভ্রষ্টতার আবর্তে ঘুরপাক খেতে হবে আজীবন। যেমন ঘুরপাক খাচ্ছে শিয়া, কাদিয়ানি এবং মওদুদীরা। এদের মধ্যে মওদুদী মতাবলম্বীদের কণ্ঠই উচ্চকিত দেখা যাচ্ছে। এদের কণ্ঠ ও কার্যকলাপ স্তব্ধ করে দেয়ার দায়িত্ব খাঁটি মোমেনদের উপরেই বর্তায়। বাতিলের বিষদাঁত ভেঙ্গে চুরমার করে দিতেই হবে।

মওদুদী এবং তাদের অনুসারীদের প্রতি আল্লাহ্তায়ালার অভিসম্পাত। তারা হজরত রসুলেপাক স. এর সম্মানিত সাহাবাবৃন্দের রা. প্রতি অপবাদ আরোপকারী। হেদায়েতের নক্ষত্রতুল্য সাহাবাসমাজকে সত্যের মাপকাঠি বলে মানে না তারা। রসুলে মকবুল স. ইরশাদ করেছেন, 'আমার সাহাবাবৃন্দের ব্যাপারে তোমরা আল্লাহ্কে ভয় করো। তাদেরকে তোমরা সমালোচনার লক্ষস্থল বানিয়ো না।' মওদুদী একথা মানেনি। সাহাবা সম্প্রদায় সম্পর্কে আল্লাহ্তায়ালার ঘোষণা 'রাদিআল্লাহু আনহুম-ওয়া রাদু আনহু' (তাঁদের প্রতি আল্লাহ্তায়ালা সন্তুষ্ট এবং তাঁরাও আল্লাহ্তায়ালার প্রতি সন্তুষ্ট)। কিন্তু মওদুদী তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট নয়। তাই 'খেলাফত ও মুলুকিয়াত' বই লিখে মওদুদী অনেক সম্মানিত সাহাবার চরিত্র হনন করেছে। দোষারোপ করেছে তাঁদেরকে। অথচ তাঁদের বিরুদ্ধে মওদুদীর আনীত সবকয়টি অভিযোগ মিথ্যা। নিশ্চয়ই মিথ্যা।

আশ্চর্য আচরণ মওদুদীবাদীদের। তারা কি জানে না, কোরআন মজিদ এবং হাদিস শরীফে কতোভাবে যে সাহাবাবৃন্দের প্রশংসা করা হয়েছে। তাঁদের দুর্নাম রটনার সময় মওদুদীরা নিশ্চুপ। আর মওদুদীর মতো সাহাবাবিদ্বেষী লোকের দুর্নাম করলেই তারা ক্ষেপে ওঠে তেলে বেগুনে। তাদের কতা-বার্তা এবং আচরণ দেখে মনে হয় মওদুদীই ইসলামের পৃষ্ঠপোষক। রসুলেপাক স., সাহাববৃন্দ এবং তাঁদের অনুসারী লক্ষ লক্ষ সত্যাশ্রয়ী মুফাসসীর, মুহাদ্দিস, মুজতাহিদ, আওলিয়া, দরবেশ কিছুই নন।

কী জঘন্য তাদের কার্যকলাপ। তারা হজরত মুয়াবিয়া রা. এর বিরুদ্ধে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অভিযোগ এনেছে। কিন্তু বর্তমান সৌদি রাজতন্ত্র বড়ই পছন্দ তাদের। এ রহস্যের কারণ কি? তাদের অসৎ কার্যকলাপের অনেক নজির আছে। তার মধ্যে একটি দৃষ্টান্ত অনন্যসাধারণ, ঐতিহাসিক। যেমন সারা জীবন 'কোরআনের আইন-সৎলোকের শাসন' শ্লোগান দিয়ে তারা প্রতিষ্ঠা করেছে মহিলা শাসন। অথচ মহিলা নেত্রীত্ব হারাম। নিশ্চিত হারাম। কী অদ্ভুত তাদের কোরআনের আইন প্রচলনের নমুনা।

আমরা বিস্ময় মানি ঐ সমস্ত ওলামা ও মাশায়েখদের প্রতি যারা মওদুদী ফেৎনার প্রতি উদাসীন। আবেদন করি, আপনারা সোচ্চার হন। আহবান জানান সবাইকে– মওদুদী ফেৎনা উৎখাতের আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে। ঘোষণা দিন, মওদুদী ফেৎনা প্রতিহত করা সকলের ইমানী দায়িত্ব।

আলহামদুলিল্লাহ্। আমরাতো বিশ্বাস করি ইমানের পূর্ণ বৈভব লাভ করতে গেলে আমাদেরকে 'আল্লাহ্র ওয়াস্তে বন্ধুত্ব এবং আল্লাহ্র ওয়াস্তেই শত্রুতা' এই বাক্যের উপর আমল করতেই হবে। তাই হজরত রসুলেপাক স. এর প্রিয় দৌহিত্র হজরত ইমাম হোসেন রা. এর মতো নিরাপোষ ব্যক্তিত্বের অনুরাগী আমরা। আমাদের জানা আছে রসুলেপাক স. এর পবিত্র মুখনিসৃত বাণী– 'আমার আহলে বায়েত (বংশধর) নূহ আ. এর কিশতিতুল্য। যে ব্যক্তি এতে আরোহণ করলো সে নিরাপদ।' হাদিস শরীফে আরো উল্লিখিত হয়েছে, 'আহলে বায়েতের মহব্বত ইমানের অঙ্গ।' আমাদের ইমানকে শানিত করতে হলে আহলে বায়েতের মহব্বতে আমাদের অন্তর আলোকিত করে রাখতেই হবে। স্মৃতিচারণ করতে হবে তাঁদের।

তাই কারবালার শোকাবহ ঘটনার বিবরণ আমাদের প্রিয় প্রসঙ্গগুলির অন্যতম। হজরত ইমাম হোসেন রা. এর মহান শাহাদতের ঘটনা আমাদের অন্তরে সৃষ্টি করে শোকের উথাল পাথাল তরঙ্গ। আবার শোকের সেই উচ্ছসিত তরঙ্গমালাই আমাদেরকে দেয় জেহাদের সবক। শোক পরিণত হয় শক্তিতে। সফলতার আশায় বুক বাঁধি আমরা। কানে বাজে উজ্জীবনের শাশ্বত নির্ভয়তা, নাসরুম মিনাল্লাহি ওয়া ফাতহুন করিব ওয়া বাশশিরিল মু'মিনীন (আল্লাহর সাহায্য নিকটবর্তী–মোমেনদের জন্য সুসংবাদ)।

সীমাহীন মেহেরবাণী আল্লাহ্তায়ালার তিনি আমাদেরকে **'ফোরাতের তীর'** প্রকাশ করতে শক্তি দিয়েছেন চতুর্থবারের মতো। যাবতীয় প্রকারের উৎকৃষ্ট দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক মহানবী মোহাম্মদ স., তাঁর পবিত্র পরিবার পরিজন, বংশধরগণ এবং সম্মানিত সাহাবাবৃন্দের প্রতি। আমিন।

আমাদের আর একটুখানি কথা বলার আছে। সে কথা হচ্ছে এইঃ আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের আকিদা অনুযায়ী নিজেদের আকিদা বিশ্বাস বিশুদ্ধ করে নেয়ার পরে যে দায়িত্বটি আমাদের প্রধান হয়ে দাঁড়ায় সেটি হচ্ছে আমাদেরকে রসুলে মকবুল স. কর্তৃক আনীত শরীয়তের পুরোপুরি পাবন্দ হতে হবে। এর জন্য করণীয় আমলের (নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত, হারাম, হালাল ইত্যাদি) এলেম অর্জন করতে হবে। তদনুযায়ী আমল করতে হবে এবং সেই সঙ্গে এখলাস (বিশুদ্ধ নিয়ত) অর্জন করতে হবে। এই এখলাস অর্জন করতে গেলে তরিকার মাশায়েখদের নিকট বায়াত গ্রহণ করতে হবে। এখলাস অর্জনের দ্বিতীয় আর কোনো পথ নেই। আর একথা নিশ্চিত যে, খাস মোজাদ্দেদিয়া তরিকা এখলাস অর্জনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে সহজ তরিকা। আমরা এই তরিকা প্রচারের কাজে নিয়োজিত আছি। আল্লাহ্ অন্বেষণকারীগণ যোগাযোগ করতে পারেন।

ওয়াস্ সালাম।

মোহাম্মদ মামুনুর রশীদ
হাকিমাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেদিয়া
ভুঁইগড়, নারায়নগঞ্জ।

আমাদের বই

- তাফ্সীরে মাযহারী (১–১২) মোট ১২ খণ্ড।
- মাদারেজুন্ নবুওয়াত (১-৮) মোট ৮ খণ্ড
- মুকাশিফাতে আয়নিয়া
- মাআরিফে লাদুন্নিয়া
- মাব্দা ওয়া মা'আদ
- মকতুবাতে মাসুমীয়া (১-৩) মোট ৩ খণ্ড
- নকশায়ে নকশ্বন্দ
- বায়ানুল বাকী
- জীলান সূর্যের হাতছানি
- নূরে সেরহিন্দ
- কালিয়ারের কুতুব
- প্রথম পরিবার
- মহাপ্রেমিক মুসা
- তুমিতো মোর্শেদ মহান
- নবীনন্দিনী
- পিতা ইব্রাহীম
- আবার আসবেন তিনি
- সুন্দর ইতিবৃত্ত
- চেরাগে চিশ্তী
- মহাপ্লাবনের কাহিনী
- দুজন বাদশাহ্ যাঁরা নবী ছিলেন
- কী হয়েছিলো অবাধ্যদের
- THE PATH
- পথ পরিচিতি
- নামাজের নিয়ম
- রমজান মাস
- ইসলামী বিশ্বাস
- BASICS IN ISLAM
- মালাবুদ্দা মিনহু
- সোনার শিকল
- বিশ্বাসের বৃষ্টিচিহ্ন
- সীমান্তপ্রহরী সব সরে যাও
- তৃষিত তিথির অতিথি
- ভেঙে পড়ে বাতাসের সিঁড়ি
- নীড়ে তার নীল ঢেউ
- ধীর সুর বিলম্বিত ব্যথা

বেলা বাড়ছে।

সূর্যের তেজও বাড়ছে।

সোনালী মখমলের মতো হৃদয় ছোঁয়া ভোরের আলো কলজে ছেঁচা খুনের মতো টকটকে লাল হয়ে উঠছে ধীরে ধীরে। পায়ের নিচের চিকচিকে চুমকী ছড়ানো বালু কণাগুলো তারই ছোঁয়া পেয়ে বিন্দু বিন্দু আগুনে রূপ নিচ্ছে। এক সময় যখন ওই বিন্দুগুলো আগুনের সমুদ্রে রূপ নেবে, তখন কি অবস্থা হবে শিবির বাসীদের?

শিবির পড়েছে কারবালায়। হজরত হোসেন রা. এর শিবির। সেই শিবিরের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি ভাবছেন অসহায় নারী পুরুষ, শিশু কিশোর, যুবক বৃদ্ধ মিলিয়ে আশিজন মানুষের কথা। কি উপায় হবে তাদের।

এক ফোঁটা পানি নেই শিবিরে। তৃষ্ণায় কণ্ঠ তালু সব শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে সবার। শত্রুপক্ষ ফোরাতের তীর ঘিরে রেখেছে। কোনো ভাবেই পানি নিতে দেবে না তারা। জালিমেরা পানি বন্ধ করে ইমাম বংশকে ধ্বংস করতে চায়। শুকিয়ে মারতে চায় তিল তিল করে আশিজন অসহায় মানুষকে।

তেশরা মুহাররম হজরত আব্বাস ইবনে আলী ত্রিশজন সঙ্গী নিয়ে শত্রুপক্ষের ব্যূহ ভেদ করে ফোরাত নদী থেকে মাত্র বিশ মশক পানি সংগ্রহ করেছিলেন। আশিজন মানুষের তাতে ক'দিন চলে? ফোঁটায় ফোঁটায় খরচ করেও শেষ হয়েছে সেই অমূল্য সম্পদ। পানিবিহীন অবস্থায় তারপরেও কেটেছে তিনটি দিন। বয়সী মানুষগুলো নিজেদেরকে প্রাণপণে ধরে রাখলেও কচি বাচ্চারা এই সীমাহীন কষ্ট কেমন করে সইবে? কণ্ঠস্বর বসে গেছে। শব্দ করে কাঁদতেও পারছে না ওরা।

পানির অভাবে শরীর যাচ্ছে শুকিয়ে। হাত-পা অবসন্ন হয়ে আসছে ধীরে ধীরে। মনোবলও ভেঙ্গে পড়ছে সবার। এভাবে আর কতক্ষণই বা নিজেদের রক্ষা করতে পারবে ওরা? ফোরাতের তীর যদি আর ক'টা দিন শত্রুপক্ষ ঘিরে রাখে এবং পানির ব্যবস্থা যদি কোনো ভাবেই না করা যায় তাহলে এমনিতেই একে একে সবাইকে শাহাদাতবরণ করতে হবে।

হজরত ইমাম হোসেন রা. কি করবেন বুঝতে পারছেন না। তিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন, কোনো অবস্থাতেই শত্রুকে আগে আক্রমণ করবেন না। আহা, ওরাতো অবুঝ, এতো করে বুঝানোর পরেও কোনটা ভাল, কোনটা মন্দ বুঝতে চাইছে না। ওরা শুধু ওবায়দুল্লাহ বিন যেয়াদের অত্যাচারের ভয়েই নিজেদের মানবিক বোধকে খুইয়ে বসে আছে। হতভাগারা বুঝতে চাইছে না মানুষকে যিনি সৃষ্টি করেছেন সেই রহমানুর রহিম আল্লাহ্ই এক মাত্র মৃত্যু দিতে পারেন। বাঁচা-মরার তিনিই একমাত্র মালিক। ওবায়দুল্লাহ বিন যেয়াদ কুফার শাসনকর্তা ছাড়াতো কিছু নয়।

আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের প্রতি আস্থা থাকলে অমন শত সহস্র ওবায়দুল্লাহ নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে। কিন্তু হায় কুফাবাসী তোমরা পারলে না সত্যের রশিকে শক্ত করে ধরে রাখতে। রসুলে করিম স. বিদায় হজ্বে কি সমবেত সাহাবাদের উদ্দেশ্যে বলেননি, 'তোমরা যদি দু'টো জিনিষ শক্ত করে ধরে রাখতে পারো তাহলে কোনো দিনই তোমাদের বিচ্যুতি ঘটবে না, এক, আল্লাহ্র কোরআন আর দুই, রসুল স. এর হাদিস।

মূর্খরা কি বোঝে না, যার ঈমানের তেজ নেই, তার কিছুই নেই। সেই ঈমানের দৃঢ়তাই যদি না রইলো তাহলে পশুর সাথে তার তফাৎ রইলো কি? সে কি মানুষের মাঝে নিজেকে মানুষ বলে পরিচয় দিতে পারে?

আজ এইখানে, এই কারবালা প্রান্তরে যাদের মুখোমুখী দাঁড়িয়ে হজরত ইমাম হোসেন রা.কে যুদ্ধের সর্বাত্মক প্রস্তুতি নিতে হচ্ছে, তারাইতো চিঠির পর চিঠি দিয়ে কুফায় হিজরত করার জন্য তাগিদ দিয়েছিলো। তারাইতো বলেছিলো, 'আপনি আসুন হে সত্যের সৈনিক, আমরা আপনাকেই আমাদের ইমাম স্বীকার করছি। আপনি এলেই আমরা আমাদের সত্যপথের দিশা পাবো। হে সত্য পথের দিশারী, আমরা সবাই আপনার আগমনের আশায় আকুল আগ্রহে অপেক্ষা করছি।'

কিন্তু কি বিস্ময়কর ব্যাপার! আজ তারা সবাই একবাক্যে অস্বীকার করছে; সমস্বরে বলছে, ওই সব চিঠির একটাও তাদের লেখা নয়। এমনকি ওসব চিঠির কথাও তারা জানে না। হোর ইবনে ইয়াযিদতো স্পষ্টই বলে ফেলেছে যে, হজরত ইমাম হোসেন রা. কে আনতে যারা চিঠি লিখেছিলো তারা কেউই তাদের দলের নয়। তাছাড়া ওবায়দুল্লাহ বিন যেয়াদের কাছে হজরত ইমাম হোসেন রা.কে পৌঁছে দেবার জন্য তার প্রতি যে হুকুম হয়েছে, সৈনিক হিসাবে তার কর্তব্য সেই হুকুম সঠিকভাবে পালন করা।

হোরের কথা শুনে থমকে গিয়েছিলেন হজরত ইমাম হোসেন। তীব্র কণ্ঠে প্রতিবাদ করে বলেছিলেন, 'মৃত্যুর পূর্বে তা সম্ভব নয়।'

সেই সাধের মরণ আজ মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। তাই তো আজ কান্নার দিন নয়। নয় বিলাপের দিন। আজ সত্যকে অসত্যের বিরুদ্ধে, ন্যায়কে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠা করার দিন। সে জন্য যে আত্মত্যাগ, সেখানে কান্নার স্থান কোথায়? এই মরণতো সুখের মরণ– বড় বেশী মহিয়ান। অনেক বেশী গরিয়ান।

বোন যয়নবের অস্থিরতা লক্ষ্য করে হজরত হোসেন তাকে বলেছিলেন, 'তুমিতো জানো, প্রত্যেক প্রাণীই মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হচ্ছে। একি অবস্থা করেছো তোমরা? অস্থির হয়ে ঈমানের দৃঢ়তা হারালেতো চলবে না বোন। পৃথিবীর প্রত্যেক জীবের জন্যই মৃত্যু নির্ধারিত হয়ে আছে, এমনকি আকাশের ফেরেশতাগণও বেঁচে থাকবে না। রসুলুল্লাহ স. এর জীবনের আদর্শই আমাদের পাথেয়। ধৈর্য, দৃঢ়তা এবং আল্লাহ্‌র উপর সর্বাবস্থায় সন্তুষ্ট থাকাই তাঁর শিক্ষা। এ শিক্ষা থেকে কোনো অবস্থাতেই বিচ্যুত হওয়া চলবে না।'

কিন্তু চোখের সামনে যখন মৃত্যু ধীরে ধীরে তার হিম শীতল হাত বাড়িয়ে একে একে সবাইকে ছিনিয়ে নিতে চায়, তখন কোমল প্রাণা নারীহৃদয় অধৈর্য না হয়ে কি পারে? পারে না। আর পারে না বলেই সবার মঙ্গলাকাঙ্খায় বুকের মাঝে তুফান ওঠে। সেই তুফানের আঘাতে ডাগর চোখে নোনা পানির বান ডাকে। দুচোখ ছাপিয়ে সেই পানি নেমে আসে অঝোর ধারায়।

মৃত্যু সত্য। মৃত্যু চিরন্তন। তার আহবানতো এই পৃথিবীতে কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। আঠার হাজার মাখ্‌লুকাতের সবাইকে এর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। হজরত ইমাম হোসেন রা. 'কাসবে বনী মোকাতেল' নামক স্থান ছেড়ে আসবার অল্প পরেই জানতে পেরেছিলেন, সময় নেই। হাতে আর সময় নেই। খুব তাড়াতাড়িই তাকে রাব্বুল আলামীনের দরবারে উপস্থিত হতে হবে।

ঘোড়ার পিঠে তন্দ্রাছন্ন হয়ে তিনি যে স্বপ্ন দেখেছিলেন তাইতো আজ সত্যে পরিণত হতে চলেছে। সত্যে পরিণত হতে চলেছে হজরত আলীর ক. শাহাদাতের সময়ের শেষ উপদেশ বাণী। তিনি বলেছিলেন, 'তোমাদের শত্রুগণকে তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌ প্রবল করে দেবেন, তোমাদের দোয়া আল্লাহ্‌র দরবারে কবুল হবে না।' (তাবারী ৬ষ্ঠ খণ্ড)।

হজরত ইমাম হোসেন রা. বুঝতে পারলেন, সেই সত্যই আজ দিনের মতো পরিষ্কার হয়ে উঠছে। নিজেকে তাই তিনি নির্বিঘ্ন চিত্তে আল্লাহ্‌র ইচ্ছার প্রতি সমর্পণ করলেন। তারপর শত্রুর মুখোমুখি হবার জন্যে মনে প্রাণে প্রস্তুত হতে লাগলেন। শিবিরের ভেতর অসুস্থ জয়নাল আবেদীন রা. সহ আত্মীয় পরিজন ক্ষুধায় তৃষ্ণায় ছটফট করছে। ভেসে আসছে তাদের নানা কণ্ঠের করুণ আর্তনাদ। পানি, এক ফোঁটা পানি চাই।

এই সব অসহায় মানুষের করুণ আর্তনাদে দুলে উঠতে চাইলো ইমামের মন। কিন্তু তিনি সেদিকে নিজের মনকে আবিষ্ট না করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন।

হজরত আমীর মুয়াবিয়া রা.'র ইন্তেকালের পর তাঁর একমাত্র ছেলে ইয়াজিদ মুসলিম বিশ্বের শাসন ক্ষমতা নিজহাতে তুলে নেয়। সে সময় কুফার গভর্নর ছিলেন নোমান ইবনে বশির। তিনি এ সংবাদ জানার পর পরই সমস্ত দেশে ঘোষণা দেন যে, নতুন শাসক ইয়াজিদের হাতে সবাইকে বায়াত গ্রহণ করতে হবে।

কুফার উমাইয়া সমর্থকগণ কোনো প্রকার দ্বিধা না করেই ইয়াজিদের পক্ষে বায়াত গ্রহণ করে। কিন্তু হজরত আলী রা.'র অনুসারীরা তা না করে নিজেদের মধ্যে গোপন বৈঠকের ব্যবস্থা করেন এবং সেই বৈঠকে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেন যে, হজরত ইমাম হোসেন রা.কে তারা কুফায় আহবান করে নিয়ে আসবেন এবং তাঁর হাতেই সবাই বায়াত গ্রহণ করবেন।

এই সময় হজরত ইমাম হোসেন রা.ও মদীনা থেকে নিরাপত্তার জন্য সপরিবারে মক্কায় চলে আসেন এবং সেখানে পৌঁছে তিনি বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করেন যে, মক্কাবাসীরা হজরত আবদুল্লাহ্ বিন জোবায়ের রা.কে নেতা মনোনীত করে ইয়াজিদের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলছেন। হজরত ইমাম হোসেন তাঁর হাতেও বায়াত গ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত নেন।

কুফায় হজরত আলী রা.'র পক্ষীয় নেতা ছিলেন সোলায়মান বিন সরু খাযায়ী। তিনি কুফাবাসীদের এক বিশাল সমাবেশে খুব পরিষ্কারভাবে সবাইকে এই বলে হুঁশিয়ার করে দেন যে, 'যদি তোমরা মৃত্যুকে ভয় না পাও, যদি সত্যের প্রতি দৃঢ় এবং অবিচল থাকতে পারো, তাহলে হজরত ইমাম হোসেন রা. কে এখানে আহবান করে নিয়ে এসো। আর যদি নিজেদের প্রতি বিশ্বাস না থাকে তাহলে এখানে ডেকে নিয়ে এসে তাঁকে বিপদে ফেলো না।'

সোলায়মান বিন সরু খাযায়ীর কথায় কুফাবাসী একযোগে সমর্থন জানিয়েছে। বলেছে, 'অবশ্যই আমরা সত্যের প্রতি অবিচল থাকবো, তাঁকে সাহায্য করবো এবং শত্রুদের ধ্বংস করে দিয়ে সসম্মানে খেলাফতের আসনে বসাবো।'

এরপরই শুরু হয়েছে এক যোগে চিঠি লেখার পালা। শুরু হয়েছে দূত মারফত ইমাম হোসেনের কাছে সেই সব চিঠি পৌঁছে দেয়ার পালা।

একের পর এক চিঠি আসতে লাগলো ইমাম হোসেনের কাছে। তিনি চিঠি পেলেন কুফার বিভিন্ন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের কাছ থেকে। চিঠি পেলেন সাধারণ মানুষের কাছ থেকে। তাদের এক একটা চিঠির ভাষা এতই আবেগপ্রবণ ছিলো যে, তা পড়লেই মনে হতো হজরত ইমাম হোসেন রা. ছাড়া আর কোনো ব্যক্তিকে কোনো অবস্থাতেই তারা ইমাম বলে মেনে নেবে না। এমনকি যারা ক্ষমতায় আছে, প্রয়োজনে তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে গিয়ে যদি জীবন বিসর্জন দিতে হয়, তাতেও দ্বিধা করবে না।

চিঠির পর চিঠি পেয়ে বেশ চিন্তিত হয়ে পড়লেন হজরত ইমাম হোসেন। তিনি বন্ধু বান্ধবদের সাথে পরামর্শ করলেন। জানতে চাইলেন তাদের মতামত।

সবাই তাঁকে নিষেধ করলেন কুফায় যাবার জন্যে। নিষেধ করলেন হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.। তিনি তো সরাসরিই বললেন, 'আপনি ওদের কথা কখনই বিশ্বাস করবেন না। যখনই দেখবেন আপনার শত্রুপক্ষ আপনার চেয়ে বেশী শক্তিশালী, তখন তারা আবার আপনার বিরুদ্ধেই অস্ত্র ধারণ করবে।'

শুধু হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.ই নন, চাচাত ভাই আবদুল্লাহ ইবনে জাফর রা.ও চিঠি দিয়ে নিষেধ করলেন। নিষেধ করলেন ইয়াজিদের নিযুক্ত শাসনকর্তা আমর ইবনে সাঈদ ইবনুল আস। কিন্তু এতো নিষেধ সত্ত্বেও কোনো কাজ হলো না। হজরত হোসেন রা. নিজেই সিদ্ধান্ত নিলেন, কুফাতেই যাবেন তিনি এবং সেই মোতাবেক তিনি সপরিবারে সফরের প্রস্তুতি শুরু করলেন।

আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধব, হিতৈষী সুহৃদ সবাই হায় হায় করে উঠলেন তার এই সিদ্ধান্তের কথা শুনে। কারণ সবাই নিশ্চিত, কুফাবাসীরা তাঁকে যতই মিষ্টি মধুর চিঠি লিখুক না কেনো, যতই আশা আর আশ্বাসের বাণী শোনাক না কেনো, কুফার গভর্ণরের হুমকী এলে সাথে সাথেই তাদের ভোল পালটে যাবে এবং নিজেদের অবস্থান ইয়াজিদের পক্ষে নিয়ে যেতে এক মুহূর্তের জন্যেও দ্বিধান্বিত হবে না তারা। সব রকম প্রচেষ্টা চালিয়েও যখন কিছু করা গেলো না তখন হজরত হোসেন ও তার পরিবারকে আল্লাহ্‌র হাতে সঁপে দিয়েই নিশ্চুপ রইলেন সবাই। যথাসময়ে সপরিবারে হজরত হোসেন কুফার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন।

পথে সাফ্‌ফাহ্‌ নামক স্থানে বিশ্বনবী হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মোজতবা স. এর পরিবারের একনিষ্ঠ ভক্ত বিখ্যাত কবি ফারাযদকের সাথে হজরত ইমাম হোসেন রা. এর দেখা হলো। তিনি তাঁর কাছে কুফার জনগণের মনোভাব সম্পর্কে জানতে চাইলেন। উত্তরে কবি ফারাযদক জানালেন, 'তাদের মন আপনার সঙ্গে, কিন্তু তরবারী বনি উমাইয়াদের সাথে।'

কথা শুনে হজরত ইমাম হোসেন রা. বললেন, 'সত্যিই বলেছো, কিন্তু এখন সবই আল্লাহ্‌র হাতে। তাঁর ইচ্ছাতেই সবকিছু ঘটে। রব্বুল আলামীন প্রতি মুহূর্তেই তাঁর নির্দেশ জারী করছেন। সেই নির্দেশ আমাদের অনুকূলে হলে আমরা তার প্রশংসা করি, না হলেও আমরা আমাদের নেক নিয়ত ও তাকওয়ার সওয়াব নিশ্চয়ই পাবো।'

কবি জবাবে আর কোনো কথাই বললেন না। ইমাম হোসেন তাঁর কাফেলাকে পুনরায় সামনের দিকে এগিয়ে যেতে নির্দেশ দিলেন।

সবার মনে হলো, হজরত ইমাম হোসেন রা. ভুল করলেন। এই আপাতঃ নিশ্চিত জীবনকে ফেলে মৃত্যুর দিকে রওয়ানা দিলেন। রওয়ানা দিলেন আলো থেকে অন্ধকারের দিকে, সুন্দর থেকে ভয়ংকরের দিকে। এই চলা আর কোন ভাবেই রোধ করা যাবে না।

কিন্তু হজরত ইমাম হোসেন রা. কি জানেন না, তিনি কোন পথে চলেছেন? তিনি কি বোঝেন না তাঁর শেষ পরিণতি কি হতে পারে? তিনিতো অবুঝ শিশু নন। অপরিণামদর্শী কিশোর নন। অসহিষ্ণু যুবকও নন। এখন তিনি প্রবীণ। তাঁর বয়স ছাপ্পান্ন বছর পার হয়ে গেছে। তিনি যা করছেন তা তো কখনই ছেলেমানুষী হতে পারে না। তাহলে এটাকি আল্লাহ্‌র অদৃশ্য ইঙ্গিতেরই স্বাভাবিক স্বীকৃতি?

যে যাই বলুক তিনিতো জানেন, এখন এই মুহূর্ত থেকেই শুরু হলো অন্ধকার থেকে প্রকৃত আলোর পথে অভিসার। মিথ্যার প্রাচীর ভেঙ্গে সত্যের পথে অপ্রতিরোধ্য জয়যাত্রা।

তায়েফে প্রাণপ্রিয় নানাজী, আল্লাহ্‌র প্রিয় বন্ধু রহমাতুললিল আল আমীন, বিশ্বনবী স. এই শান্তির ধর্ম প্রচার করতে গিয়ে কি অত্যাচারই না সহ্য করেছেন। সমস্ত শরীর তায়েফবাসীর প্রস্তরাঘাতে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। রক্তের স্রোত নেমে

ভরে গেছে পায়ের জুতো। তাদের এই নিষ্ঠুর ব্যবহারে থমকে গেছে বাতাস। চমকে গেছে আকাশ। পাহাড় পর্বত পর্যন্ত ফেটে পড়তে চেয়েছে তায়েফবাসীর এই নিষ্ঠুরতায়। প্রেরিতদূত জিবরাঈল আ. পর্যন্ত আল্লাহ্‌র প্রিয় দোস্তের এই নিদারুণ অবস্থা সইতে না পেরে বলেছেন, 'হে আল্লাহ্‌র রসুল, আপনি বলুন, আমি দুই পাহাড় এক করে তাদের ধ্বংস করে দেই।'

ধৈর্যের প্রতীক রহমাতুললিল আল আমীন সেই অনুরোধ মেনে নেননি। আহত রক্তাক্ত হস্ত মোবারক সেই বিশ্বপালকের দিকে তুলে ফরিয়াদ করেছেন, 'হে আল্লাহ্! তাদের তুমি ধ্বংস করে দিলে আমি কার কাছে তোমার এই শান্তির ললিত বাণী পৌঁছাবো? তুমি যে দয়ার সাগর, করুণাময়, একথা আমি কার কাছে জানাবো মাবুদ? তুমি তাদের ক্ষমা করে দাও।'

আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন প্রিয় নবী স. এর কথা শুনেছেন। মুক্তি দিয়েছেন তায়েফবাসীকে। আর তাইতো প্রসার লাভ হয়েছে ইসলামের। প্রতিষ্ঠিত হয়েছে জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ ধর্ম হিসাবে।

ওহোদের যুদ্ধে পবিত্র দান্দান শহীদ হয়েছে দ্বীনের নবীর স.। রক্ত ঝরাতে হয়েছে পবিত্র দেহ থেকে। এই ত্যাগ, এই তিতিক্ষাই, পরবর্তী যুদ্ধগুলোতে এনেছে জয়ের মালা। এমনি করে ঈসা আ. এর আত্মত্যাগ, ইব্রাহীম আ. এর কোরবানী, মুসা আ. এর উত্তাল নীলনদে ঝাঁপিয়ে পড়া– এই সবকিছুই দেশ জাতি ও সমাজের কল্যাণ বয়ে এনেছে যুগে যুগে, কালে কালে। হজরত ইমাম হোসেন রা.ও সেই রকমই ত্যাগের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে চান।

কারবালার উত্তপ্ত জমিনে দাঁড়িয়ে সমস্ত পরিবেশ পরিস্থিতি মুহূর্তেই উপলব্ধি করলেন হজরত ইমাম হোসেন রা.। দেখলেন, ওবায়দুল্লাহ বিন যেয়াদের নির্দেশে ওমর ইবনে সা'আদের নেতৃত্বে সারিবদ্ধভাবে ফোরাতের তীর বেষ্টন করে রেখেছে ইয়াজিদের সৈন্যরা। এক ফোঁটা পানিও না দিয়ে তারা তিলে তিলে ধ্বংস করে দিতে চায় ইমাম বাহিনীকে।

শেরে খোদা হজরত আলী রা. এর প্রাণপ্রিয় স্নেহের দুলাল হজরত ইমাম হোসেনকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, 'আত্মসমর্পণ করো। ইয়াজিদের কাছে বায়াত

গ্রহণ করো। তাহলে তোমাকে সসম্মানে পৌঁছে দেয়া হবে কুফায়। নিশ্চিন্ত জীবন যাপন করতে পারবে সেখানে। নইলে নিষ্ঠুরভাবে মৃত্যুবরণ করতে হবে এই কারবালার ময়দানে।'

তা কি করে হয়? সে জীবনতো ঘৃণার। সে জীবনতো লজ্জার। যাঁরা মুসলমান, যাঁরা দ্বীনের জন্য সর্বদা উৎসর্গীকৃত প্রাণ, তারা কি কখনও এই অন্যায় নির্দেশ মানতে পারেন? দেহে এক বিন্দু রক্ত থাকতে অন্যায় আহবানের কাছে আত্মসমর্পন করতে কি পারেন কোনো মর্দে মোমিন?

সুতরাং যুদ্ধ। যুদ্ধই এর শেষ সমাধান। সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে মৃত্যু যদি আসে, আসুক না। ন্যায়কে ঊর্ধ্বে তুলে ধরতে মৃত্যুকে হাসিমুখে আলিঙ্গন করা অনেক বেশী মহত্বের। অনেক বেশী গৌরবের।

শিবিরে কান্নার রোল উঠেছে। পানি চাই। এক ফোঁটা পানি চাই। আহ! তৃষ্ণায় মরে যাচ্ছি আমরা সবাই। মরে যাচ্ছে শিশুপুত্র আসগর। মরে যাচ্ছে অসুস্থ্য যুবক জয়নাল আবেদীন। মরে যাচ্ছে অন্যান্য নারী পুরুষ বৃদ্ধ। কে তাদের মুখে এক ফোঁটা পানি তুলে দেবে? কে তাদের শোনাবে আশ্বাস বাণী, 'ওরে আর ভয় নেই, ফোরাতের তীর মুক্ত। শত্রুরা পদানত। তারা ভীরু মেষ শাবকের মতো যুদ্ধস্থান পরিত্যাগ করে ঊর্ধ্বশ্বাসে পালিয়েছে। এসো, হে সোনার মানুষ, হে দ্বীনের নবীর ফরজন্দ, এসো, প্রাণভরে পান করো এই ধরার শরাবন তহুরা।'

নেই। কেউ নেই। সবাই ইয়াজিদের ভয়ে নিজেদের অস্তিত্বকে, অহম বোধকে খুইয়ে বসে আছে। মৃত্যুভয় মানুষকে এতোবেশী ভীত সন্ত্রস্ত করতে পারে, হজরত ইমাম হোসেন, এদের না দেখলে কিছুতেই বিশ্বাস করতেন না।

হায় কুফাবাসী, খেলাফতের প্রকৃত উত্তরাধিকারীর মর্যাদা দিলে না তোমরা। হত্যাকারীর পদতলে নিজেদের মনুষ্যত্বকে বিলিয়ে দিলে। শেষ বিচারের দিনে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের কাছে কি জবাব থাকবে তোমাদের? কিভাবে বলবে, 'মাবুদ, তোমার প্রিয় দোস্ত স.-এর ফরজন্দ-এর সাথে আমরা বিশ্বাসঘাতকতা করেছি। কথা দিয়ে কথা রক্ষা করিনি।'

এই হয়। এইটাই বুঝি নিয়ম। বিশ্বাসঘাতকরা যখন সংখ্যায় বাড়তে থাকে তখন বারে বারে বিপর্যস্ত হয় সত্যের সংগ্রাম। বিধ্বস্ত হয় ন্যায় নীতি আর আদর্শ। কিন্তু সত্যের সেই সংগ্রাম স্তব্ধ হয়েছে কি কোনো কালে? উচ্ছল জলতরঙ্গকে বালির বাঁধ দিয়ে কোথায় কে কবে রুখতে পেরেছে? সেই দুর্ণিবার তরঙ্গমালা আবার নতুন শক্তিতে আঘাত হেনেছে। নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে সব প্রতিবন্ধকতা। আবার আলোয় আলোময় হয়েছে দশ দিগন্ত। পাখির কাকলিতে, ফুলের সুরভিতে, ভ্রমরের কলগুঞ্জনে মুখরিত হয়েছে বিশ্ব চরাচর।

এসেছে আঘাত। বাধাগ্রস্থ হয়েছে স্রোত। ভেঙ্গেছে বাঁধ। উত্তাল হয়েছে সত্যের জোয়ার। এভাবেই চলেছে পৃথিবী। চলছে এখনও। চলবে অনন্তকাল।

আকাশের কোথাও মেঘ নেই এক চিলতে। পাখিদের আনা-গোনাও নেই কোথাও। যতদূর দৃষ্টি যায় পরিষ্কার ঝকঝকে নীল আকাশ। আকাশ আর জমীন জুড়ে বাতাসও থমকে আছে। দম বন্ধ করা গুমোট প্রকৃতি। দূরে দিগন্তরেখায় মরীচিকার হাতছানি। দেখে মনে হয় আর একটা 'ফোরাত' বুঝি ওই দিক দিয়েই বয়ে চলেছে। অবচেতন মন হঠাৎ দুলে ওঠে, আহ, পানি। ওইতো পানি। ওইতো বেহেশ্‌তী সূধা, শরাবান তহুরা।

হজরত ইমাম হোসেন, দু'হাত তুলে আল্লাহ্‌র দরবারে প্রার্থনা করলেন, 'ইয়া আল্লাহ্‌, ইয়া রহমানুর রহিম, সবরকম বিপদে একমাত্র তুমিই আমার ভরসা। সুদিনের মত দুর্দিনেও তুমিই আমার সহায়। একের পর এক অসংখ্য বিপদের মুখোমুখী হচ্ছি। মন ক্রমেই দুর্বল হয়ে আসছে। মাবুদ, বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার কোনো পথই আর আমি খোলা দেখছি না। বন্ধু বেশে যারা কাছে এসেছিলো, আজ তারা বিশ্বাসঘাতকতা করে দূরে সরে দাঁড়িয়েছে। শত্রুরা তাই দেখে আনন্দ উল্লাসে মেতেছে। কিন্তু আমি, হে পরওয়ারদিগার, আমি কেবল তোমারই আশ্রয় ভিক্ষা চাই। হে দয়ার সাগর, হে করুণাময়, তুমি, শুধু তুমিই আমার একমাত্র আশ্রয়স্থল।'

প্রার্থনা শেষে হজরত ইমাম হোসেন দৃষ্টি ফেরালেন শিবিরের পশ্চাতে। আগুন জ্বলছে পরিখায়। শত্রুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য তিনি তার অনুসারীদের নিয়ে প্রচণ্ড পরিশ্রম করে এই পরিখা খনন করেছেন। মাত্র তো কয়েকজন মানুষ যারা অস্ত্র ধরতে পারেন। ৩২ জন অশ্বারোহী, আর বাকী সবাই পদাতিক। সামনে দাঁড়িয়ে ওই যে উত্তাল সমুদ্রের মতো শত্রু সৈন্য আক্রমণের অপেক্ষায় উন্মুখ, তাদের কাছে এই কয়জন কতক্ষণই বা টিকতে পারবে? খড় কুটোর মত উড়ে যাবার কথা মুহূর্তেই। তাই আত্মরক্ষার জন্য তৈরী করতে হয়েছে এই পরিখা। আর সেই পরিখার মধ্যে জ্বালিয়ে দিতে হয়েছে আগুন।

পিতা শেরে খোদা হজরত আলী রা.'র কাছে তিনি শুনেছেন নানাজী'র যুদ্ধ কৌশলের কথা। সেই বিখ্যাত খন্দকের যুদ্ধের কথা।

কোরাইশ বাহিনীর দশ হাজার সুদক্ষ সৈন্যের বিরুদ্ধে মাত্র তিন হাজার মুসলিম সৈন্য। প্রকৃত যোদ্ধার সংখ্যা যার মধ্যে একেবারেই নগণ্য। যুদ্ধ সরঞ্জামও এক রকম নেই বললেই চলে। তার উপরে যুদ্ধ কৌশল ক'জনই বা জানেন?

অনভিজ্ঞ মুসলিম বাহিনী ঈমানী বলে বলীয়ান হয়ে মাঠে নামতে পারবে, হাসি মুখে শহীদও হতে পারবে কাতারে কাতারে, কিন্তু সেতো হলো অন্য কথা। যুদ্ধে জয়লাভ করতে হলে, প্রতিপক্ষের সুদক্ষ সৈন্য বাহিনীকে আঘাতে আঘাতে পর্যুদস্ত করতে হলে, পরাজিত ও বিতাড়িত করতে হলে নতুন নতুন কৌশলের প্রয়োজন।

দ্বীনের নবী, আল্লাহ্‌র দোস্ত স. বিখ্যাত সাহাবা সালমন ফারসী রা. এর সহায়তায় কৌশল বের করলেন। এবার আর উন্মুক্ত প্রান্তরে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ নয়। নিজেদের অবস্থানের চারিদিকে পরিখা খনন করে তার ভিতরে অবস্থান করবেন মুসলিম বাহিনী। কোরাইশ বাহিনী যেনো সেই পরিখা পেরিয়ে কোনো ভাবেই ঢুকতে না পারে। না পারে আচমকা আক্রমণ করে মুসলিম বাহিনীর মনোবল ভেঙ্গে দিতে। পরিখা খনন শুরু হলো। নবীজি স. নির্দেশ দিলেন প্রতি দশজনে দশ গজ করে খনন করবে– গভীরতা হবে পাঁচ গজ। সে নির্দেশ মেনে নিয়ে তিন হাজার বীর মুসলিম পেটে পাথর বেঁধে বিশ দিনে খনন করলেন সেই বিখ্যাত পরিখা যা দেখে শত্রুরা হতবাক হয়ে আক্রমণের আশা ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলো। ইতিহাসে সেই যুদ্ধ আজও খন্দকের যুদ্ধ নামে বিখ্যাত হয়ে আছে।

ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত ইমাম পরিবারের পুরুষেরা হাতে হাত মিলিয়ে তেমনি করে তৈরী করেছেন এই পরিখা। আগুন জ্বালিয়েছেন তাতে। যেনো পেছন থেকে আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়তে না পারে শত্রুসেনারা। সেই আগুনই তার লেলিহান শিখা ছড়িয়ে বাতাসকে করে তুলেছে দুঃসহ। নিঃশ্বাস নিতেও কষ্ট হয়। শত্রুপক্ষের অশ্বারোহী সেনারা সারারাত ধরে শিবিরে প্রবেশের চেষ্টা চালিয়েছে কিন্তু আগুনের পরিখা অতিক্রম করার দুঃসাহস দেখাতে পারেনি কেউ।

হজরত ইমাম হোসেন রা. তার সহচরদের নিয়ে রাত্রি কাটিয়েছেন আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামীনের দরবারে প্রার্থনা করে, নামাজ পড়ে আর উচ্চস্বরে কোরআনের আয়াত পাঠ করে।

'শত্রুরা যেনো মনে না করে যে, আমার এই সংযম তাদের মঙ্গল ডেকে আনবে। আমরা আমাদের ধৈর্য দিয়ে তাদের অপরাধের মাত্রাই বাড়াচ্ছি না শুধু, তাদের জন্য আল্লাহ্‌র কঠিন শাস্তি, অপমানও নির্ধারিত হয়ে আছে। আল্লাহ্‌ ঈমানদারদের এমন অসহায় অবস্থায় ফেলে রাখবেন না, যে অবস্থায় তোমরা রয়েছো। তিনি পবিত্রকে অপবিত্র থেকে আলাদা করে দেবেন।'

এই আয়াত শুনে শত্রুপক্ষের একজন অশ্বারোহী চিৎকার করে উত্তর দিয়েছে 'কা'বার প্রভুর কসম। আমরাই পবিত্র এবং তোমাদের থেকে আমাদেরই আলাদা করা হয়েছে।'

দু'বছরের শিশু পুত্র আসগর র.-এর ক্লান্ত ও অবসন্ন আর্ত চিৎকার ভেসে এলো। হজরত ইমাম হোসেনের চিন্তায় ছেদ পড়লো। শিশু পুত্রের কান্না শুনে অস্থির হয়ে উঠলেন তিনি। আহ! কচি বাচ্চা এক ফোঁটা পানির জন্যে তাকেও মৃত্যুর সাথে লড়তে হচ্ছে। বাপ হয়ে তিনি পারছেন না তার মুখে এক ফোঁট পানি তুলে দিতে। এ জ্বালা যে কতো তীব্র, কতো বেদানার, তাতো ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। পাষণ্ডের দল শুধু মাত্র ব্যক্তি স্বার্থের জন্য পৃথিবীর সবচাইতে নিষ্ঠুর কাজটি করতে প্রস্তুত হয়েছে। প্রস্তুত হয়েছে সবচাইতে হীন, সবচাইতে নীচ কৌশল অবলম্বন করতে।

কতো কথাইতো মনে হয় শিশুপুত্রের কান্না শুনে। তার সবচাইতে প্রিয় যে জন– সেই দ্বীন-দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ মানুষ, আল্লাহ্‌র প্রিয় দোস্ত হজরত মোহাম্মদ স.– তাঁর নানাজী। তাঁকে আর তাঁর ভাই হজরত হাসান রা.কে কতোইনা ভালোবাসতেন। যার কথা শত মুখে বর্ণনা করেও শেষ করা যাবে না।

সেই নানাজীর নামাজ পড়ার সময় তিনি তাঁর কাঁধে উঠে বসেছেন। সেজদা থেকে অনেকক্ষণ উঠতে পারেননি আল্লাহ্‌র সেই প্রিয় নবী। তাছাড়া কতদিন তিনি তাঁর পিঠে চড়ে ঘোড়া ঘোড়া খেলেছেন। সেসব নিয়ে হজরত ওমর রা. এর সাথে যে আলাপন চলেছে পরবর্তীতে তাও তিনি শুনেছেন অনেকের কাছে। কখনই তিনি নানাজী স.কে বিরক্ত হতে দেখেননি। সাহাবীদের কাছে শোনেনওনি। বরঞ্চ সেই পবিত্র চেহারায় যে প্রশান্তি তিনি দেখেছেন এবং শুনেছেন তার তুলনাতো এ জগতে নেই। বুকের মাঝেই শুধু সেই স্মৃতি জ্বল জ্বল করে জ্বলছে। জ্বলবে ততক্ষণ, যতক্ষণ তিনি এই মাটিতে দাঁড়িয়ে নিঃশ্বাস নেবার অধিকার পাবেন।

ছাপ্পান্ন বছর পার হয়ে গেছে। এরই মধ্যে ক্ষমতার লড়াইতো কম দেখেননি। রহমাতুললিল আল আমীনের স্নেহের দরিয়ায় অবগাহনও কম করেননি। কিন্তু এমন স্বার্থপরতা, বিশ্বাসঘাতকতা, নিষ্ঠুরতা তিনি আর কোথাও দেখেননি কখনো। রসুলেপাক স. কখনই অসহায়দের উপর আঘাত হানতে দেননি! আর নারী, ওরাতো অবলা। দুর্বল। ওদের সব সময়ই তিনি স্নেহ, ভালবাসা, দয়া বিতরণ করেছেন। অন্যকেও তাই করতে বলেছেন। আর আজ। আজ তারই অনুসারীরা সব কিছু ভুলে, ন্যায়নীতি বিসর্জন দিয়ে ইয়াজিদের নির্দেশ পালনে তৎপর হয়ে উঠেছে।

পরিখার আগুন জ্বলছে দাউ দাউ করে, তার সাথে তাল মিলিয়ে স্মৃতির আগুন ইমাম হোসেনের মেদ মজ্জা মাংস পুড়ে ছাই করে দিচ্ছে।

আহ্ কখন হবে প্রিয় মিলন? রব্বুল আলামীন কখন ডেকে নেবেন কাছে। কখন হবে এই অসহ্য জ্বালার পরিসমাপ্তি। কখন?

প্রিয় মিলনের আশায় উন্মুখ হজরত ইমাম হোসেন যখন বিভোর, ঠিক তখনই শিমার ঘোড়া ছুটিয়ে শিবিরের কাছে চলে এলো। ঘুরে দেখলো, শিবিরের পেছন ভাগে পরিখার ভেতর আগুন জ্বলছে। ভিতরে প্রবেশের উপায় নেই। সে চিৎকার করে ইমাম হোসেনের উদ্দেশ্যে বললো-,

–'হোসেন, কেয়ামতের আগেই কি তুমি অগ্নি স্বীকার করে নিয়েছো?'

ইমাম হোসেন রা. শিমারের কথা শুনে ঘৃণাভরে উত্তর করলেন, 'হে রাখালের সন্তান, আগুনের জন্য তুমিই উপযুক্ত।'

পরিখার পাশে দাঁড়িয়ে ইমামের কথা শুনে পিশাচের মতো হেসে উঠলো পাষণ্ড শিমার। মুসলিম ইবনে আউসাজা শিমারের ওই হাসি লক্ষ্য করে হজরত ইমাম হোসেন রা.কে অনুরোধ করে বললেন,

–'হজরত, আপনি একবার হুকুম করুন, শয়তানটাকে এখুনি তীর ছুঁড়ে চির জীবনের মতো ঠাণ্ডা করে দেই। সে এখন আমার নাগালের মধ্যেই রয়েছে।'

–'না আউসাজা, তা হয় না। আমিতো বলেছি শত্রুকে আমরা কখনই আগে আঘাত করবো না।'– ধৈর্যশীল ইমাম হোসেন রা. মুসলিম ইবনে আউসাজা'র কথা শুনে শান্ত স্বরে উত্তর দিলেন।

ইমাম হোসেনের কথা শুনে বিস্মিত হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলেন মুসলিম ইবনে আউসাজা। 'আহা, এমন সোনার মানুষ। চরম বিপদেও যিনি শত্রুকে আঘাত করতে রাজী নন, সেই মহাপ্রাণকে কেনো আজ ওরা নিশ্চিহ্ন করে দিতে চাইছে। তাদের এই অন্যায়ের বিচার আল্লাহ্ কি করবেন না? নিশ্চয়ই করবেন।

অথচ এই শিমারতো অনাত্মীয় কেউ নয়। ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ই বলতে হয় তাকে।

নবী দুলালী খাতুনে জান্নাত, ফাতেমাতুজ্ জোহরা রা. এগারো হিজরীর তেশরা রমজান এই নশ্বর পৃথিবী ছেড়ে মাবুদের কাছে চলে গেছেন। কিন্তু রেখে গেছেন তাঁর নাড়ি ছেড়া ধন। আট বছরের আর সাত বছরের দুই শিশু পুত্র। হজরত ইমাম হাসান রা. এবং হজরত ইমাম হোসেন রা.।

হজরত আলী রা. বিচলিত হয়ে উঠলেন এই দুই নাবালক শিশুপুত্রের ভবিষ্যত চিন্তা করে। নানাজী হজরত মুহাম্মদ স. নেই– যিনি সব সময় তাঁর এই দুই নাতিকে বুকের সাথে জড়িয়ে রাখতেন। যাদের কান্না রহমাতুল্লিল আল আমীন মুহূর্তের জন্যও সইতে পারতেন না। যিনি এদের কান্না শুনলে মেয়ের কাছে ছুটে গিয়ে অনুযোগ করতেন, 'ফাতেমা, তুমিতো জানো ওদের কান্না আমি সইতে পারি না?'

যিনি শিশুদ্বয়ের পবিত্র মুখ চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দিয়ে সাহাবীদের লক্ষ্য করে বলতেন, 'যারা এদের কষ্ট দেয়, প্রকারান্তরে তারা আমাকেই কষ্ট দেয়।' তারপর তাদের বুকের সাথে জড়িয়ে নিয়ে আবেগাকুল কণ্ঠে মাবুদ রব্বুল আলামীনের কাছে প্রার্থনা করতেন 'হে আল্লাহ্ আমি এদের ভালবাসি, তুমিও এদের অনুগ্রহ করো।' সেই নানাজীও নেই।

অসহায় দুই বালক হজরত হাসান ও হজরত হোসেন রা.। রসুলে মকবুল স. নেই। নেই মমতাময়ী জননী। কে তাদের দেখবে? কে তাদের মায়ের আদর দিয়ে, স্নেহ দিয়ে, নানাজীর ভালোবাসা দিয়ে বড় করে তুলবে?

অসহায় মাতৃহারা স্নেহের কাঙাল দুই সন্তানের মুখের দিকে তাকালে হজরত আলীর সিংহহৃদয় তোলপাড় করে উঠে। বুকের ভেতর কান্নার ঢেউ উথাল পাথাল করে। তিনি তো তরবারী হাতে যুদ্ধের ময়দানে ময়দানে শত্রুর মোকাবেলা করে বেড়ান। রক্তের ফোয়ারা ছোটান বেঈমান, বে-দ্বীনের বুকের পাঁজরে বল্লমের আঘাত হেনে।

খালিদ বিন অলিদ রা. সহ অন্যান্য সেনাপতিরা যখন দূর দূরান্তরে চলে যান সৈন্য বাহিনী নিয়ে, তখন তিনি মদিনা মনোয়ারা রক্ষার গুরু দায়িত্ব পালন করেন। সময় থাকে না ঘরে ফেরার। সময় থাকে না নাবালক দুই শিশু পুত্রকে দেখাশোনার। সময় থাকে না বুকে তুলে নিয়ে তাদের চোখের পানি মুছে দেবার। তা ছাড়া তিনিতো বাপ। মায়ের ভালোবাসা তিনি কোথায় পাবেন? কোথায় পাবেন তিনি খাতুনে জান্নাতের রা. সেই আকাশ ছোঁয়া হৃদয়ের মমতা? কোথায় পাবেন তিনি রসুলে মকবুলের মতো বিশ্বপ্লাবী প্রেম-ভালবাসা?

ইসলামের খেদমতে নিবেদিত প্রাণ হজরত আলী ক. শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নিলেন বিয়ে করার। এক শুভক্ষণে বিয়ে করে ঘরে আনেন হজরত উম্মুল বানীন রা.কে। হজরত উম্মুল বানীন রা. ছিলেন শিমার যিল যওশনের আপন ফুফু। সে হিসাবে হজরত ইমাম হোসেন রা. শিমারের ফুফাতো ভাই এবং হজরত ইমাম হোসেনের মামাতো ভাই হচ্ছে শিমার। অবশ্য বিমাতার সম্পর্কে। আপন নয়। হজরত উম্মুল বানীন রা. এর গর্ভে এবং হজরত আলীর ক. ঔরষে হজরত আব্বাস রা. হজরত আব্দুল্লাহ রা. হজরত জাফর রা. এবং হজরত ওসমান রা. এই চার জন সন্তান জন্মলাভ করেন।

এই চার জনই হজরত ইমাম হোসেন রা.-এর সাথে মক্কা থেকে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে এই কারবালায় এসেছেন। ইমামের একনিষ্ঠ অনুসারী চার ভাই শিমারের মতো নিজেদের স্বার্থ কখনই বড় করে দেখেননি।

৬১ হিজরীর ২রা মুহাররম হজরত ইমাম হোসেন রা. যখন কারবালা এসে পৌঁছলেন, তখন কুফার শাসনকর্তা ওবায়দুল্লাহ্-বিন যেয়াদের নির্দেশে চার হাজার সৈন্য নিয়ে ওমর ইবনে সা'আদ এসে পৌঁছলো সেখানে। ওমর বিন সা'আদ এর বিশ্বাস ছিলো তাকে হজরত ইমাম হোসেনের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হতে হবে না। ইমাম পরিবারকে সে অন্তর থেকে শ্রদ্ধা করে। কিন্তু হৃদয়ের মাঝে প্রেম ভালোবাসা শ্রদ্ধা ভক্তি যতই থাক না কেনো, সে তা প্রকাশ করতে পারেনি কোনো অবস্থাতেই। পারেনি শুধুমাত্র দৃঢ়চিত্ততার অভাবে। তার ভয় ছিলো প্রতিনিয়তই গুপ্ত সংবাদ বাহক বুঝি তার খুটিনাটি কাজের উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখছে এবং সেসব বিবরণ নিয়মিত সংগ্রহ করে কুফায় প্রেরণ করে চলেছে। ওমরের আচার-আচরণে যদি ইমামের প্রতি কোনো প্রকার দুর্বলতা প্রকাশ পায় বা ইমাম পরিবারের প্রতি তাঁর আগ্রহ ধরা পড়ে, তাহলে হোর ইবনে ইয়াযিদের মতো তার প্রতিও হয়তো কঠোর আদেশ আসবে। তাই সে অন্তরের বিরুদ্ধেই উবায়দুল্লাহ বিন যেয়াদের হুকুম পালন করে চলেছে। কারবালা পৌঁছেই ওমর ইবনে সা'আদ হজরত ইমাম হোসেন রা. এর নিকট একজন দূত পাঠিয়ে দিয়ে জানতে চাইলো, হজরত ইমাম হোসেন রা. এর এখানে আসার কারণ কি?

হজরত ইমাম হোসেন রা. হোর ইবনে ইয়াযিদের কাছে যে কথা বলেছিলেন, এখানেও তাই বললেন,-

–'তোমাদের দেশের লোকেরাই আমাকে চিঠির পর চিঠি দিয়ে এখানে নিয়ে এসেছে। অথচ এখন দেখছি অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তারা সবাই আমাকে অস্বীকার করছে। সে যাই হোক এখন যদি তারা আমাকে গ্রহণ করতে না চায় অবাঞ্ছিত মনে করে, তবে আমি ফিরে যেতে প্রস্তুত আছি।'

ওমর বিন সা'আদ হজরত ইমাম হোসেন রা. এর এই কথা শুনে খুশী হলো। ভাবলো, যাক এবার হয়তো সংঘর্ষ এড়ানো যাবে। সে ওবায়দুল্লাহ বিন যেয়াদের কাছে পত্র লিখে জানালো হজরত ইমাম হোসেন রা. এর অভিপ্রায় সম্পর্কে।

ওবায়দুল্লাহ্ বিন যেয়াদ উত্তরে জানালো, 'এখন সে আমাদের হাতের মুঠোয় এসে পড়েছে। সুতরাং তাকে আর হাতছাড়া করা যেতে পারে না। তুমি হোসেনকে ইয়াজিদের প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করতে বলো। সেই সাথে আরো এক

কাজ করো, হোসেন ও তার পরিবারবর্গের জন্য পানি বন্ধ করে দাও, যেনো এক ফোঁটা পানিও তারা সংগ্রহ করতে না পারে– যেমনভাবে ওসমান ইবনে আফফান রা.কে পানি থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিলো। তারপর দেখা যাবে।'

নির্দেশ পেয়ে ওমর বিন সা'আদ হতবাক হয়ে গেলো। ভাবলো, আহা, রসুলুল্লাহ সল্লাল্লহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের প্রিয় দৌহিত্র। যাঁর সমস্ত শরীরেই রসুলেপাক স. এর পরশ লেগে আছে। যাঁর পবিত্র ওষ্ঠাধর অসংখ্যবার স্পর্শ করেছে ওই শ্রেষ্ঠতম পবিত্র পুরুষের ওষ্ঠ। সেই প্রিয় মানুষ হজরত হোসেন রা.-এর সাথে এবার সামনাসামনি মোকাবেলা করতে হবে।

কোনো উপায় নেই। এত বড়ো কঠোর নির্দেশ মুখ বুজেই পালন করতে হবে।

যেয়াদের চিঠির নির্দেশ মতো ওমর ইবনে সা'আদ পাঁচশত সৈন্য দিয়ে ফোরাত তীর বন্ধ করে দিলো। সেন্যদের কঠোরভাবে নিষেধ করে দেয়া হলো, কোনো অবস্থাতেই যেনো ইমাম পরিবার পানি নেবার সুযোগ না পায়। এই পাঁচশত সৈন্যের নেতৃত্বে দেয়া হলো ইবনে যেয়াদের রক্ষীবাহিনীর প্রধান আমর ইবনে হাজ্জাজকে।

হজরত ইমাম হোসেন রা. সংবাদ শুনে ক্ষুব্ধ হলেন। তিনি বুঝতে পারলেন না কেনো এই নিষ্ঠুরতা? কেনো এই অবিচার? হজরত ওসমান রা.-এর প্রতি খাদ্য-পানীয় বন্ধ করে যে অবিচার করা হয়েছিলো তার জন্য কারা দায়ী? আর এতদিন পরে সে প্রসঙ্গ উঠবেই বা কেনো?

এটাতো কেউ অস্বীকার করতে পারবে না যে, সেই ঘোর দুর্দিনে হজরত আলী রা. এর নির্দেশে হজরত ইমাম হাসান রা. জীবনকে বিপন্ন করে দিন রাত আমীরুল মুমেনীন হজরত ওসমান রা. এর নিরাপত্তার জন্যে পাহারায় নিয়োজিত ছিলেন। অথচ হতভাগারা সেই অপবাদ আজ তারই উপরে আরোপ করতে চায়।

সামনে দুর্যোগের কালো ছায়া দেখে বিচলিত হয়ে পড়লেন হজরত ইমাম হোসেন। অনেক ভেবে শেষ পর্যন্ত তিনি দূত মারফত ইবনে সা'আদকে সন্ধ্যায় দেখা করতে বললেন। মনে মনে ভাবলেন আলোচনার মাধ্যমে নিশ্চয়ই একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যাবে।

এই প্রস্তাব সাথে সাথেই মেনে নিয়ে ওমর ইবনে সা'আদ সংবাদ পাঠালো যে, বৈঠকে বসতে রাজি আছে। তবে ইমাম শিবিরে নয়, উভয় শিবিরের মাঝখানে বৈঠক হতে হবে। উভয় পক্ষের বিশজন করে সংগী অবশ্যই থাকতে হবে সেই বৈঠকে।

সেভাবেই রাতে বৈঠক শুরু হলো। গভীর রাত পর্যন্ত চললো সেই বৈঠক। তাতে অনেক আলাপ আলোচনাই হয়তো হয়েছে। কিন্তু তাঁর বেশীর ভাগই

সাধারণ্যে প্রচারিত হয়নি। যতটুকু হয়েছে সেটা ছিলো একেবারেই অনুল্লেখ্য বক্তব্য। যেমনঃ-

হজরত ইমাম হোসেন রা. ওমর ইবনে সা'আদকে বললেন, 'চলুন আমরা আমাদের নিজ নিজ সৈন্য বাহিনী এখানে রেখে ইয়াজিদের নিকট গিয়ে এর একটা সমাধানের চেষ্টা করি।'

উত্তরে ওমর ইবনে সা'আদ বললো, 'তা হয় না, আমি এ কাজ করলে আমাকে আমার ঘরবাড়ী থেকে উচ্ছেদ করা হবে।'

একথার উত্তরে হজরত ইমাম হোসেন রা. ওমর ইবনে সা'আদকে বললেন,- 'আমি আবার তা নতুন করে তৈরী করে দেবো।'

–'আপনি হয়তো তৈরী করে দেবেন। কিন্তু আমার সব স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি যখন বাজেয়াপ্ত করা হবে, তখন?'

ওমর ইবনে সা'আদ-এর কথা শুনে হজরত ইমাম হোসেন রা. পুনরায় বললেন, 'ঠিক আছে তার বিনিময়ে আপনাকে আমি আমার হেজাজের সম্পত্তি দিয়ে দেবো।'

–'তাতে কি আমার অবস্থার পরিবর্তন হবে? আমার স্ত্রী, পুত্র পরিজন– এদের নিরাপত্তা কি নিশ্চিত করা যাবে?'

ইবনে সা'আদ এর এ কথা শুনে হজরত ইমাম হোসেন রা. আর কিছু বললেন না। বুঝলেন, তাঁর কথা রক্ষা করার মতো সাহস ওমরের নেই। ফলে আলোচনা বৈঠক ভেঙ্গে গেলো।

হজরত ইমাম হোসেন আরও কয়েক বার বৈঠক করলেন। কিন্তু কাজ হলো না। প্রথম আলোচানার মতো ফলাফল দাঁড়ালো শূন্য। শেষ পর্যন্ত হজরত ইমাম হোসেন রা. ওমর ইবনে সা'আদ এর কাছে তিনটি প্রস্তাব পেশ করলেন– (১) আমাকে মদীনায় ফিরে যেতে দেয়া হোক অথবা (২) ইয়াজিদের সাথে বুঝাপড়া করার সুযোগ দেওয়া হোক অথবা (৩) আমাকে কোনো মুসলিম জনপদে পাঠিয়ে দেয়া হোক। সেখানে সাধারণ মানুষের যা হবে, আমারও তাই হবে।

প্রস্তাব তিনটির উপর বেশ কয়েকবার আলোচনার পর ওমর ইবনে সা'আদ কুফার শাসনকর্তা ওবায়দুল্লাহ্ বিন যেয়াদের নিকট এই বলে পত্র দিলো যে, 'শুকরিয়া আল্লাহ্র। বিপদ কেটে গেছে। ঝগড়ার অবসান হয়েছে। মুসলমানদের পারস্পরিক কলহ মিটে গিয়ে সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। হোসেন আমার কাছে তিনটি প্রস্তাব রেখেছেন এবং আমার কাছে ওয়াদা করেছেন, তিনি এই তিনটি প্রস্তাবের যে কোনো একটি গ্রহণ করতে রাজী আছেন। এতে আপনার এবং মুসলমানদের কল্যাণ রয়েছে।'

ওবায়দুল্লাহ্ বিন যেয়াদ যতই নিষ্ঠুর স্বভাবের মানুষ হোক না কেনো, তার ভেতরেও একটা কোমল বৃত্তি এবং মানবিক বোধসম্পন্ন বিবেক ছিলো। সেখানেই সরাসরি ওমরের চিঠির আবেদন গিয়ে প্রভাব বিস্তার করলো। যেয়াদ আনন্দিত চিত্তেই ওমরের কাছে চিঠি লিখতে বসলো। লিখলো, 'তোমাকে ধন্যবাদ। আমি হোসেনের প্রস্তাব গ্রহণ করলাম।'

কিন্তু এটুকু লেখার পরে চিঠি আর লেখা হলো না। শিমার যিল যওশন তাকে বাধা দিলো। বললো, 'হোসেন এখন আপনার হাতের মুঠোর মধ্যে এসে পড়েছে। এবার যদি সে আপনার আনুগত্য স্বীকার না করে ফসকে যায় অথবা সে যদি কোনোভাবে তার হারানো শক্তি ও সম্মান পুনরুদ্ধার করতে পারে, তাহলে আর তাকে আয়ত্বে আনা যাবে না। আপনি যদি তার কাছে দুর্বল চিত্ত বলে পরিচিত হন, তাহলে আপনার পরিণতি কি হবে চিন্তা করেছেন? নিঃসন্দেহে আপনি বিপদগ্রস্থ হবেন। সুতরাং আপনার আনুগত্য স্বীকার না করা পর্যন্ত তাকে কোনোভাবেই ছেড়ে দেয়া যায় না। আমি জানতে পেরেছি ওমর এবং হোসেন রাতের পর রাত যুক্তি পরামর্শ করছে।' এটা যে কার উদ্দেশ্যে চলছে তা আর ইবনে যেয়াদকে পরিষ্কার করে বলার প্রয়োজন পড়লো না। শিমারের কথা তার কাছে গ্রহণীয় মনে হলো।

সে ভাবলো, 'তাইতো, কখন কোন দিক দিয়ে বিপদ এসে পড়বে তারতো কোনো ঠিকঠিকানা নেই। শত্রুকে অঙ্কুরেই শেষ করে দেয়া উচিত।'

এবার ওবায়দুল্লাহ বিন যেয়াদ আগের চিঠি বাদ দিয়ে নতুন করে লেখা শুরু করলো, 'হে ওমর ইবনে সা'আদ, তোমাকে আমি যে জন্য পাঠিয়েছি তা ভুলে যাওয়া উচিত নয়। আমি হোসেনকে উদ্ধার করার জন্য তোমাকে পাঠাইনি। এমনকি আমার কাছে তার পক্ষের সুপারিশনামা পাঠাবার জন্যও বলিনি। হোসেন যদি তার সঙ্গীসহ আমার কাছে আত্মসমর্পণ করে, তবে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রয়োজন নেই। বরঞ্চ তাকে আমার কাছে নিরাপদে পৌঁছে দেবে। আর যদি এতে সে রাজী না হয়, তবে যুদ্ধই করতে হবে।'

ইবনে যেয়াদ কঠোর ভাষায় ওমরকে শাসিয়ে আরো লিখলো যে, 'তোমার প্রতি আমার নির্দেশ– যদি হোসেন আমার আনুগত্য স্বীকার না করে, তবে আর দেরী না করে যুদ্ধ ঘোষণা করবে এবং তাকে হত্যা করে তার দেহকে ছিন্নভিন্ন করবে। ঘোড়ার পদতলে দলিত মথিত করবে– কারণ সে বিদ্রোহী, দলত্যাগী। আমি প্রতিজ্ঞা করেছি যদি তাকে হত্যা করা যায়, তবে অবশ্যই তার এই পরিণতি ঘটাবো।

যদি আমার এই আদেশ তুমি যথারীতি পালন করো তবে প্রচুর পুরষ্কার পাবে, নয়তো তোমার মৃত্যু অবধারিত।'

এই চিঠি লিখে ইবনে যেয়াদ শিমার যিল যওশন-এর হাতে দিয়ে বললো, 'শোন শিমার, ওমর ইবনে সা'আদ যদি আমার এ নির্দেশ মেনে চলে তাহলে তুমি তার অনুগত হয়ে চলবে, আর যদি তা না মানে তাহলে তুমি সেনা বাহিনীর ক্ষমতা নিজহাতে তুলে নেবে এবং হোসেন এর মস্তক বিচ্ছিন্ন করে আমার কাছে পাঠিয়ে দেবে।'

এধরনের নির্দেশেরই অপেক্ষায় ছিলো শিমার যিল যওশন। সে বিনয়ে বিগলিত হয়ে ইবনে যেয়াদের কাছে পুনরায় নিবেদন করলো, 'হুজুরের কাছে আমার একটা আর্জি ছিলো। যদি দয়া করে অনুমতি করেন...,

-'বলো।' ইবনে যেয়াদ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে শিমারের দিকে তাকালো।

শিমার শ্রদ্ধামিশ্রিত কণ্ঠে বললো, 'আপনার নিশ্চয়ই অজানা নেই যে, আমার চারটি ফুফাতো ভাই হোসেনের সাথে কারবালায় অবস্থান করছে। ওরা বুঝতে পারেনি তাই হোসেনের মিঠে কথায় প্রভাবিত হয়ে তার পক্ষে যুদ্ধ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। আমি ওদের নিরাপত্তা চাই। ওদেরকে আমার কাছে নিয়ে আসার অনুমতি চাই, দয়া করে আপনি যদি একটা পত্র দিয়ে.....

-'আমার তাতে কোনো আপত্তি নেই।' ইবনে যেয়াদ উত্তর করলো। কারণ সে ভাবলো, যদি ওই চার ভাই হোসেনের দল থেকে সরে যায়, তাহলে তার জনসমর্থন কমে যাবে। ফলে পরাজয় ত্বরান্বিত হবে। অথবা সে বাধ্য হবে আত্মসমর্পণ করতে।

ভাইদের নিরাপত্তার ফরমান হাতে পেয়ে শিমার মনে মনে আনন্দিত হয়ে উঠলো। তার মনের ভিতরে যে একটা হিংসার স্রোত ধীর গতিতে প্রবাহিত হচ্ছিলো এই ফরমান হাতে পেয়ে তার গতি আরও তীব্র হয়ে উঠলো। তার ধারণা, রসুলের স. দৌহিত্র হিসাবে হজরত হাসান রা. ও হজরত হোসেন রা. যে ভক্তি, শ্রদ্ধা ও সম্মান পেয়েছেন বাকী চার জন– আব্বাস রা., আবদুল্লাহ্ রা., জাফর রা. এবং ওসমান রা. সেই সম্মান, সেই শ্রদ্ধা পাননি। হজরত উম্মুল বানীন রা.-এর গর্ভজাত বলেই তাদের ভাগ্যে হজরত ফাতেমা রা.-এর সন্তানদের মতো সম্মান জোটেনি।

আসলে এ ধারণা ঠিক নয়। কারণ হজরত আলী ক. এর ঔরশজাত সন্তান হিসাবে তাঁদেরকে সবাই সম্মান করতেন। ভালবাসতেন। এর মধ্যে কোনো কৃত্রিমতা ছিলো না।

তাছাড়া শিমার যিল যওশনের আরো একটা ইচ্ছা হয়তো মনের মধ্যে বাসা বেঁধেছিলো। হজরত হোসেনের পতন ঘটাতে পারলে হজরত আব্বাসের ভাগ্য

সুপ্রসন্ন হয়ে উঠতে পারে। সেই সাথে তার নিজের ভাগ্যেও আশাতীত কিছু জুটে যেতে পারে।

কিন্তু স্বার্থপর ব্যক্তি নিজ স্বার্থের জন্য যা ভাবে তা সব সময় সত্যে পরিণত হয় না। যদি হতো তাহলে আল্লাহ্‌র মহিমা এমন করে বিশ্বে প্রচার লাভ করতে পারতো না।

শিমার কারবালায় পৌঁছে ইবনে যেয়াদের নির্দেশনামা ওমর বিন সা'আদের হাতে দিয়ে বললো, এই চিঠির ভিতরে যে নির্দেশ আছে সেভাবেই কাজ করবেন। নইলে আমার কাছে দায়িত্ব ছেড়ে দিতে হবে। ওমর বিন সা'আদ কোনো কথা না বলে নির্দেশনামাটি হাত বাড়িয়ে নিয়ে সেখান থেকে সরে গেলো। শিমার এই অবসরে হোসেন রা. এর শিবিরের কাছে গিয়ে নিজের ফুফাতো ভাইদের ডেকে বললো, 'তোমরা আমার ফুফুর সন্তান। তাই তোমাদের প্রতি আমার কর্তব্য আছে। আমি এই চরম বিপদের মধ্যে তোমাদের ফেলে রেখে নিশ্চুপ থাকতে পারি না। তাই কুফার গর্ভনর মাননীয় ওবায়দুল্লাহ্ বিন যেয়াদকে বলে তোমাদের জন্য আমি নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছি। এই দেখো সেই নিরাপত্তা পত্র। শিমার সীলমোহর যুক্ত একটি পত্র উঁচু করে দেখিয়ে পুনরায় বললো, এবারে আর কোনো ভয় নেই তোমাদের। তোমরা আমার কাছে নির্ভয়ে চলে আসতে পারো। আমি তোমাদের হেফাজত করবো।'

শিমারের কথা শুনে আব্বাস রা. সহ অন্য তিন ভাই বিস্মিত হয়ে গেলেন। তারা ঘৃণাভরে শিমারের নিরাপত্তাপত্র প্রত্যাখ্যান করে বললেন, 'ধিক তোমাকে। তুমি আমাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছো, অথচ রসুলুল্লাহ্ স.-এর দৌহিত্রদের জন্য কিছুই করলে না। শোনো, আমরা কারও নিরাপত্তা চাই না। আল্লাহ্‌র নিরাপত্তাই আমাদের জন্য যথেষ্ট।'

শিমার তার ফুফাতো ভাইদের কথা শুনে হতবাক হয়ে গেলো। সে বুঝলো, এতদিন সে যা ভেবে এসেছে তা সম্পূর্ণ ভুল। সত্যের প্রতি নিবেদিতপ্রাণ শেরে খোদা হজরত আলী ক. হাসি মুখে শাহাদাত বরণ করতে দ্বিধাবোধ করেননি আর তাঁর ঔরশজাত সন্তান কখনো কি স্বার্থপর হতে পারে? হাসিমুখে প্রাণ দিবে তারা, কিন্তু তুচ্ছ এই জীবনের জন্য হজরত ইমাম হোসেন রা.কে পরিত্যাগ করে বিপক্ষ শিবিরে আশ্রয় গ্রহণ করবে না কোনো কালেই। হতাশ হৃদয়ে প্রতিশোধের জ্বালা বুকে নিয়ে শিমার ফিরে গেলো।

এবার অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠলো যুদ্ধ। যুদ্ধই আনবে এই দুঃসহ প্রতীক্ষার পরিসমাপ্তি। ৬০ হিজরীর ৩রা জিলহজ্জ যে যাত্রা মক্কা থেকে শুরু হয়েছিলো কুফার উদ্দেশ্যে, আজ ৬১ হিজরীর ১০ ই মুহাররম তারই পরিসমাপ্তি হতে চলেছে এই কারবালায়।

কতো চড়াই উৎরাই, কতো বন্ধুর পথ, কতো দুর্গম এলাকা পার হয়ে, কত পাহাড় পর্বত অতিক্রম করে সাঁইত্রিশ দিন পর এই কারবালায় যে যবনিকা রব্বুল আলামীন টানতে চাইছেন তার প্রতি নত মস্তকে, অবনত চিত্তে সমর্থন জানাতে হজরত ইমাম হোসেন রা. তো প্রস্তুত হয়েই আছেন।

আশা আর আকাঙ্খার গোলাপগুলো মনের গোপন কোণে যে আনন্দ আর আবেগের পাপড়ি মেলেছিলো, তাতো এই মরুভূমির প্রচণ্ড উত্তাপে আর ইবনে যেয়াদের বিশ্বাসঘাতকতায় একটা একটা করে ঝরে গেলো। এবার – হে ইমাম পরিবার, তোমরা তেরী হও। কতইনা সৌভাগ্য তোমাদের। তোমরা আজ সেই মহান ইমামের সাথী হয়ে শাহাদাতের পেয়ালা পান করবার সুযোগ লাভ করেছো, যিনি জান্নাতে জান্নাতি যুবকদের ইমাম (নেতা) হবেন।

ছাপান্ন বছর আগে রহমাতুল্লীল আল আমীন স. বলেছিলেন একথা। বলেছিলেন, হাসান এবং হোসেন বেহেশতী যুবকদের নেতা হবে। তাঁদের নামও রেখেছিলেন রসুলেপাক স . নিজে। হাসানের এক বছর পর দুনিয়ায় এসেছিলেন হোসেন। হাসান মানে সুন্দর। হোসেন মানেও তাই।

সেই শিশু হোসেন আজ ছাপ্পান্ন বছরের প্রবীন। তিনি পিতা হজরত আলী ক. এর প্রিয় তরবারী জুলফিকার হাতে নিয়ে আজ শত্রুর মোকাবেলায় অটল পাহাড়ের মতো দাঁড়িয়ে আছেন আগুন ঢালা বালির সমুদ্রে। বুকে হাজার ফোরাতের তৃষ্ণা। শিবিরে নারী, পুরুষ, শিশুর পিপাসাকাতর আহাজারি আর সামনে ফোরাতকুল ঘিরে পাঁচ হাজার শত্রু সেনার আস্ফালন।

শত্রু। হায়রে শত্রু। কি বিচিত্র শত্রু। ওরাওতো আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস করে। বিশ্বাস করে তার প্রিয় দোস্ত রসুলুল্লাহ স.কে। বিশ্বাস করে তাঁর প্রেরিত সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ জীবন বিধান আল কোরআনকে। তাঁর হুকুম আহকামকে। শুধু বিশ্বাস করতে চায়নি হজরত আলী ক.'র খেলাফতকে। বিশ্বাস করতে চায়নি তার সন্তান

হজরত ইমাম হাসান রা. এবং হজরত ইমাম হোসেন রা. এর খেলাফতকে। আর এ জন্যই বিরোধ। হজরত ইমাম হাসান রা. যেমন তাঁর স্বভাবগত সৌজন্য এবং উদারচিত্ততার কারণে নিশ্চুপ ছিলেন, তেমনিভাবে হজরত ইমাম হোসেন রা. যদি নিশ্চুপ থাকতেন, তাহলে হয়তো আজকের এই পরিস্থিতির মুখোমুখি তাঁকে দাঁড়াতে হতো না।

কিন্তু ইমাম হোসেন তো ইমাম হাসান নন। ইমাম হাসান রা. ছিলেন সর্বাবস্থায় ধীরস্থির ও শান্ত। কিন্তু ইমাম হোসেন রা. ছিলেন কোমলের প্রতি কোমল আবার কঠোরের প্রতি কঠোর। স্বার্থান্ধ ইয়াজিদ ও ওবায়দুল্লাহ বিন যেয়াদ একথা ভালোভাবেই জানতো। তাই তাঁর অস্তিত্ব নিশ্চিহ্ন না করা পর্যন্ত স্বস্তি পায়নি তারা। আসলে কোন স্বার্থপর শাসকই তার প্রতিপক্ষকে নিশ্চিহ্ন না করা পর্যন্ত স্বস্তি পায় না।

স্বস্তি কি হজরত ইমাম হোসেন রা. নিজেও পেয়েছিলেন? পাননি। তাঁর চাচাত ভাই মুসলীম ইবনে আকীলকে যেদিন কুফায় পাঠিয়েছিলেন তার পক্ষ হয়ে কুফাবাসীদের বায়াত গ্রহণ করার জন্যে, তখন থেকেই তিনি স্বস্তি পাননি এতটুকুও। একটা দুশ্চিন্তার পাহাড় সবসময়ই তাঁর বুকের উপর চেপে বসেছিলো। সেই সময় নানা মুখে নানা কথা বিক্ষিপ্তভাবে তাঁর কানে এসে পৌঁছতে শুরু করে। কেউ বলেছেন কুফায় যাওয়া নিরাপদ নয়। কেউ বলেছেন এখনই উপযুক্ত সময়। আবার কেউ বলেছেন কুফাবাসী দু'মুখো সাপ। ওরা এক মুখে আহবান করবে আর অন্য মুখে অবলীলায় মারবে ছোবল।

বিশ্বাসের ভিত একবার দৃঢ় হয়। আবার বালুর পাহাড়ের মত ধ্বসে পড়ে। স্বস্তি হারিয়ে যায়। সংবাদ পেয়েছেন তিনি, কুফাবাসী মুসলীম ইবনে আকীলকে সাদরে গ্রহণ করেছে। তাঁর কাছে হজরত ইমাম হোসেন রা. এর লেখা চিঠি পেয়ে দলে দলে বায়াত গ্রহণ করেছে। আরো সংবাদ পেয়েছেন অল্প কিছুদিনের মধ্যেই আঠার হাজার মানুষ মুসলীম ইবনে আকীল-এর হাতে বায়াত গ্রহণ করেছে।

মুসলীম ইবনে আকীল কুফাবাসীদের উষ্ণ সম্বর্ধনা, আন্তরিক ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে গেছেন। তাঁর মনে হয়েছে ইমাম হোসেনের মদীনায় আর সময় ক্ষেপণ করা উচিত নয়। এক্ষুণি এসে এ মহান দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নেয়া দরকার। তাই

তিনি আব্বাস বিন সোয়াইবের মাধ্যমে কুফার অবস্থা বর্ণনা করে একটা চিঠি লিখে দিলেন ইমাম হোসেনকে। মুসলীম লিখলেন, 'এ পর্যন্ত আঠারো হাজারের মতো লোক আমার হাতে বায়াত গ্রহণ করেছে। তারা সকলেই আপনার প্রতি অনুগত ও খেলাফতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। তারা ইয়াজিদকে খলিফা হিসাবে মানতে রাজী নয়। আপনি সত্বর এখানে এসে এই মহান দায়িত্ব গ্রহণ করলে এখন আর কোনো অসুবিধা হবে না বলেই আমি মনে করি। তাই আর কালবিলম্ব না করে আপনি এখানে চলে আসুন।

এই চিঠি পাওয়ার পর অস্বস্তির কাঁটা যতই বুকের ভিতর খচখচ করুক না কেনো, হজরত ইমাম হোসেন রা. কুফা রওয়ানা হতে সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন। তাঁর ভাই। তাঁর চাচাত ভাই। একই রক্তের স্রোতধারা দুই দেহের শিরায় উপশিরায় বহমান। সেই ভাই মুসলীম। মুসলীম ইবনে আকীল, ইসলামের জন্যে নিবেদিতপ্রাণ পুরুষ। তার কথাতো অবিশ্বাস করা যায় না।

তাছাড়া আল্লাহ্‌র ইচ্ছাতো অন্য। মানুষের সাধ্য কি তা বুঝতে পারে। তিনিও পারলেন না। কুফায় যে দ্রুত পটপরিবর্তন ঘটতে শুরু করেছে, মক্কায় বসে এসবের কিছুই জানতে পারলেন না তিনি। বরঞ্চ বসরার বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দের কাছে চিঠি পাঠিয়ে তিনি তাদের মনোভাব জানতে চাইলেন। সেই সাথে কামনা করলেন তাদের সাহায্য ও সহযোগিতা।

বসরার একজন বিশিষ্ট নেতা ইয়াজিদ বিন মসউদ। শুধু ধনে বা জনে নন, ক্ষমতা আর প্রভাব প্রতিপত্তিতেই নন–জ্ঞানী, গুণী, বিজ্ঞ ও বিবেচক হিসেবেও তাঁর সমধিক পরিচিতি ছিলো সেখানে। এ জন্য কুফার গর্ভনর ওবায়দুল্লাহ বিন যেয়াদও তাঁকে সমীহ করে চলতো।

এই ইয়াজিদ বিন মসউদের কাছে যখন ইমাম হোসেনের চিঠি এসে পৌঁছলো তখন তিনি বনু হালখালা, বনু তাসীম এবং বনু সাদ গোত্রের নেতৃবৃন্দের সাথে খেলাফতের ব্যাপারে বিস্তারিত আলাপ করলেন। তাদের জিজ্ঞেস করলেন, 'আমাকে আপনাদের কেমন লোক বলে মনে হয়?

সব গোত্র প্রধানই সমস্বরে উত্তর করলেন,-'উত্তম, বিচক্ষণ, সৎ ও ন্যায়পরায়ণ বলেই মনে করি।

ইয়াজিদ বিন মসউদ পুনরায় প্রশ্ন করলেন, আমি কি আপনাদের কোনো সময় বিপথে চালিত করেছি?

–না। আপনার উপদেশ সবসময়ই আমাদের সঠিক পথ দেখিয়েছে।

– এমন কোন কাজ কি আমি করেছি যার জন্যে আপনাদের দুঃখ এবং কষ্ট ভোগ করতে হয়েছে?

– না এজন্যে আপনার প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ।

–তাহলে আজ যদি আমি আপনাদের এমন কোনো কথা বলি.....থামলেন ইয়াজিদ বিন মসউদ। সবার দিকে তাকিয়ে নিলেন একবার। তারপর বললেন, যে কথা আপনাদেরকে সত্যের সন্ধান দেবে, সে কথা কি আপনারা বিশ্বাস করবেন?

সবাই একসাথে উত্তর করলেন, 'অবশ্যই বিশ্বাস করবো। আপনি বলুন কি সে কথা?'

সবার কাছে আশ্বাস পেয়ে ইয়াজিদ বিন মসউদ বললেন, 'হজরত হোসেন বিন আলী রা. আমার কাছে চিঠি দিয়েছেন। বেআইনী উমাইয়া খিলাফতের অবসান কামনা করে তিনি আমাদের সাহায্য চেয়েছেন। আপনারা অবশ্যই জানেন, এই খেলাফত পাওয়ার প্রকৃত হকদার হজরত হোসেন বিন আলী রা. কিন্তু তাঁর প্রতি অবিচার করা হয়েছে। ইয়াজিদের এই অন্যায় অধিকারের অবসান হওয়া উচিত। আর এর অবসান চাইলে সবাইকে হজরত হোসেনের হাতে বায়াত গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত হতে হবে। এতে জীবনের ঝুঁকি আছে। কিন্তু যদি সত্য প্রতিষ্ঠা করতে চান তাহলে ঝুঁকি আমাদেরকে নিতেই হবে। এখন বলুন আপনারা কি করবেন?

ইয়াজিদ বিন মসউদ এর নিকট আসল ঘটনা জানতে পেরে সবাই অনুপ্রাণিত হয়ে আবেগমথিত কণ্ঠে বলে উঠলো, 'হে ইয়াজিদ বিন মসউদ, আমরা আপনার সাথে আছি। আমৃত্যু থাকবো। আপনি আমাদের নেতা। সুখে, দুঃখে সব সময় আমরা আপনাকে আমাদের পাশে পেয়েছি। সত্য ও ন্যায়ের জন্যে আজও আমরা আপনার নির্দেশিত পথে এগিয়ে যেতে কোনো দ্বিধা করবো না'।

খুশি হলেন ইয়াজিদ বিন মাসউদ। খুব খুশী হলেন তিনি স্থানীয় নেতৃবৃন্দের মনোভাব জানতে পেরে। তারপর তিনি হজরত ইমাম হোসেনের কাছে চিঠি লিখলেন। লিখলেন, 'আপনি চলে আসুন হে রসুলুল্লাহ স. এর ফরজন্দ। আমরা আপনার খেদমতের জন্য উন্মুখ হয়ে আছি। আপনার কদম-স্পর্শে ধন্য হবে এই জমীন। আপনার মূল্যবান উপদেশ ও সাহচর্য পেলে আমাদের জীবন বসরাই গোলাপের মতো সৌরভমণ্ডিত হয়ে উঠবে। আমরা ধন্য হবো আপনার পরশ পেয়ে। ধন্য হবে এদেশ। এদেশের মাটি।'

চিঠি লিখে ইমাম হোসেন রা. এর কাছে দূত পাঠানো হলো। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, পথে ইয়াজিদের গুপ্তচর মুনজির বিন জারুদের হাতে ধরা পড়ে গেলো সেই দূত।

মুনজির চিঠিসহ দূতকে ওবায়দুল্লাহ বিন যেয়াদের দরবারে নিয়ে গেলো। চিঠি পড়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলো সে। ভয়ও পেলো। ভাবলো, এ চিঠি যদি হোসেনের হাতে পড়তো তাহলে কি সর্বনাশই না হতো। এদেশের কিছু লোকের অতি উৎসাহ হোসেনের খেলাফতের আকঙ্খাকে আকাশচুম্বি করে তুললে হয়তো তাঁকে আর ঠেকিয়ে রাখা যেতো না এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে কিছুমাত্র দেরী হতো না।

কঠোর হয়ে উঠলো ইবনে যেয়াদের মুখ। তখুনি দূতকে হত্যা করার নির্দেশ দিলো সে। তারপর জামে মসজিদে দাঁড়িয়ে বসরাবাসীদের কঠোরতম ভাষায় হুঁশিয়ার করে দিলো। তার হুমকিতে ভীত হয়ে গেলো বসরাবাসী। জীবনের ভয়ে অবনত মস্তকে হজরত ইমাম হোসেনের পক্ষ ত্যাগ করে সবাই ইয়াজিদের পক্ষে চলে গেলো আবার।

এতোসব ঘটনা ঘটে গেলো। কিন্তু ইমাম হোসেন রা. এর কিছুই জানতে পারলেন না। শুধু মুসলীম বিন আকীলের চিঠি পেয়ে তিনি ধারণা করলেন, কুফাবাসী, বসরার নেতৃবৃন্দ তার নেতৃত্ব কামনা করে অধির আগ্রহে অপেক্ষা করছেন। জমীন প্রস্তুত। এখন শুধু বীজ বপনের অপেক্ষা।

মুসলীম ইবনে আকীল যে গোপনে হজরত ইমাম হোসেনের পক্ষে কুফাবাসীকে বায়াত করে চলেছেন, এ সংবাদ ইবনে যেয়াদের কাছে গোপন রইলো না বেশী দিন।

ওবায়দুল্লাহ্ বিন যেয়াদ যখন জানতে পারলো, হজরত ইমাম হোসেনের ভাই মুসলীম কুফায় কোনো এক বিশিষ্ট ব্যক্তির আশ্রয়ে থেকে গোপনে ইমামের পক্ষে বায়াতের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন, তখন সে মাকাল বিন ইয়াসার নামক এক অতি চতুর গুপ্তচরকে এই ব্যাপারে সঠিক সংবাদ সংগ্রহের জন্য নিয়োগ করলো। তিন হাজার দেরহাম দিয়ে বলা হলো, যে করেই হোক মুসলীমের সংবাদ সংগ্রহ করবে। তার হাতে বায়াত গ্রহণ করবে এবং এই তিন হাজার দেরহাম নজরানা

হিসাবে পেশ করবে যেনো তার বিশ্বাস অর্জন করতে পারো। আরো বলা হলো মাকাল যদি সঠিকভাবে কাজ সম্পন্ন করতে পারে, তাহলে পুরস্কার হিসাবে তাকে প্রচুর অর্থ দেয়া হবে।

অর্থের লোভে মাকাল বিন ইয়াসার পথে নামলো মুসলীম ইবনে আকীলকে খুঁজে বের করার জন্য।

অলিগলি শত পথ ঘুরতে ঘুরতে নানান লোকের সাথে আলাপ করতে করতে একদিন হঠাৎ এক বৃদ্ধের কাছ থেকে মুসলীম ইবনে আকীলের আস্তানার সন্ধান পেয়ে গেলো মাকাল। সাথে সাথে সেই আস্তানায় গিয়ে ইবনে আকীলের হাতে বায়াত গ্রহণ করে তিন হাজার দেরহাম নজরানা দিলো মাকাল। তারপর বিস্তারিত খবর সাথে সাথেই পৌঁছে দিলো কুফায় ওবায়দুল্লাহ্ বিন যেয়াদের দরবারে।

খবর পেয়ে উল্লসিত হয়ে উঠলো কুফার গভর্ণর। সেনাবাহিনীকে তখুনি নির্দেশ দিলো মুসলীম ইবনে আকীলের আশ্রয়দাতা কুফার গোত্রাধিপতি হানী বিন হানীকে গ্রেফতার করে দরবারে হাজির করার জন্যে।

নির্দেশ মতো সেনাবাহিনী হানী বিন হানীকে গ্রেফতার করে নিয়ে এলো ওবায়দুল্লাহ্ বিন যেয়াদের দরবারে। মুসলীমকে আশ্রয়দানের অপরাধে শুরু হলো হানীর উপর অত্যাচার। নির্মম নিষ্ঠুর অত্যাচার। রক্তাক্ত করে ফেলা হলো তাঁর শরীর।

ইবনে যেয়াদের একই কথা, 'মুসলীম ইবনে আকীলকে চাই। আমীরুল মুমেনীন ইয়াজিদের পক্ষে বায়াত গ্রহণ না করে হোসেনের পক্ষে বায়াত গ্রহণ করেছে সে। মুসলীম বিদ্রোহী। হোসেন বিদ্রোহী। বিদ্রোহীর একমাত্র শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। আর সেই বিদ্রোহীকে তুমি সাহায্য করেছো। আশ্রয় দিয়েছো। সুতরাং তোমারও ক্ষমা নেই। তোমাকেও সেই একই শাস্তি পেতে হবে।' অর্থাৎ মুসলীম ইবনে আকীলকে প্রাণ দিতে হবে। প্রাণ দিতে হবে হানী বিন হানীকে।

কিন্তু এদের মৃত্যুদণ্ড দিতে গেলে দেশে বিদ্রোহ দেখা দিতে পারে। দেখা দিতে পারে গৃহযুদ্ধ। সম্মানে, প্রতিপত্তিতে হানী বিন হানী একেবারে তুচ্ছ নন। তাঁর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করলে কুফার জনগণ বিদ্রোহী হয়ে উঠতে পারে। দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলো ওবায়দুল্লাহ্ বিন যেয়াদ। শেষে ঠিক করলো, হুমকী দিতে হবে, কঠোরতম ভাষায় হুমকী দিতে হবে ওই সব ভীরু কুফাবাসীকে যাতে তারা প্রতিবাদ করার দুঃসাহস না পায়। তারপর শাস্তি দিতে হবে হানীকে।

যে কথা, সেই কাজ। হানীর বিচারের রায়ের জন্য অপেক্ষারত ভীত, উৎকণ্ঠিত জনগণকে উদ্দেশ্য করে যেয়াদ বললো, 'হানীর পক্ষ নিয়ে যারা কথা বলবে এবং বিদ্রোহী মুসলীমের পক্ষ যারা নেবে, তাদের কাউকেই ক্ষমা করা হবে না। নিষ্ঠুরভাবে প্রাণ দিতে হবে তাদেরও।'

ভীরুপ্রাণ কুফাবাসী শেষ পর্যন্ত মুখবুঁজে রইলো। না পারলো অন্যায়ের মৌখিক প্রতিবাদ করতে, না পারলো আল্লাহ্ ও রসুলের আদর্শকে মেনে নিয়ে জেহাদ করতে। শুধু মৃত্যু ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত মূষিকের মত প্রাণ বাঁচানোর জন্য তৎপর হয়ে উঠলো তারা।

সব পথ পরিষ্কার করে ওবায়দুল্লাহ বিন যেয়াদ মুহম্মদ বিন আশআছকে পাঠালো মুসলীমকে গ্রেফতার করার জন্য। আশআছ, হানী বিন হানীর বাড়ী ঘেরাও করে মুসলীম ইবনে আকীলকে আত্মসমর্পণ করতে আহবান জানালো। কিন্তু মুসলীম তার আহ্বান প্রত্যাখ্যান করলেন। তিনি তরবারী কোষমুক্ত করে ঘোষণা করলেন, হত্যা না করা পর্যন্ত কেউ আমাকে গ্রেফতার করতে পারবে না।

আশআছ বুঝতে পারলো, মুসলীম জীবিত থাকতে কখনোই আত্মসমর্পণ করবেন না। তাই সে বিনীত কণ্ঠে আহ্বান জানালো, 'হে আকীলের পুত্র, আপনি কেনো ইচ্ছা করে বিপদ ডেকে আনছেন। এতগুলি সৈন্যের বিরুদ্ধে একাকী যুদ্ধ করে আত্মরক্ষা করা কখনোই সম্ভব নয়। আপনি দয়া করে আত্মসমর্পণ করুন। আমি নিজে আপনার হেফাজতের দায়িত্ব গ্রহণ করছি। আমি কথা দিচ্ছি আপনার কোনো ক্ষতি হতে দেবো না। বিশ্বাস করুন আপনার কোনো ভয় নেই।

মুসলীম ইবনে আকীল ক্ষণকাল চিন্তা করে দেখলেন, এরা প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করলেও তাঁর কিছু করার থাকবে না। কারণ তাকে হত্যা করার ইচ্ছা থাকলে যে কোনো একটা অজুহাত খুঁজে নেবেই। এ অসম যুদ্ধে কিছু সৈন্য হয়তো তাঁর হাতে মারা যাবে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ধরা তাকে পড়তেই হবে। তাই আত্মসমর্পণ করাই ভালো। তাছাড়া ওবায়দুল্লাহ্ বিন যেয়াদের আসল রূপটাও একবার দেখা দরকার।

তিনি বললেন, 'ঠিক আছে, আমি তোমার কথা বিশ্বাস করে আত্মসমর্পণ করছি। কিন্তু মনে রেখো তোমরা যদি বিশ্বাস ভঙ্গ করো, তাহলে এর পরের পরিণতির জন্য আল্লাহ্র কাছে তোমরাই দায়ী থাকবে।'

ওবায়দুল্লাহ বিন যেয়াদের দরবারে উপস্থিত হবার পরই মুসলীম বুঝতে পারলেন, মুহম্মদ বিল আশআছ তার সাথে প্রবঞ্চনা করেছে। দরবারে উপস্থিত লোকের মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝলেন, এরাও কেউ তার পক্ষ হয়ে কথা বলবে না। যা কিছু করার নিজেকেই করতে হবে। তখন তিনি দৃঢ় কণ্ঠে যেয়াদকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'হে ইবনে যেয়াদ, তুমি আমাকে এখানে কেনো এনেছো?'

ইবনে যেয়াদ উত্তর করলো, 'তুমি কুফাবাসীদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছো। যারা আমীরুল মোমেনীন ইয়াজিদের পক্ষে বায়াত গ্রহণ করেছে, তাদেরকেও তুমি বিপথে চালিত করে হোসেনের পক্ষে বায়াত গ্রহণ করার জন্য অনুপ্রাণিত করেছো।'

দৃঢ়তার সাথে মুসলীম উত্তর করলেন, 'হ্যাঁ করেছি। কারণ এই খেলাফতের হকদার হজরত ইমাম হোসেন রা.। ইয়াজিদ নয়। তোমরাই চুক্তি ভঙ্গ করে ইমামের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছো।'

মুসলীমের কথা শুনে ইবনে যেয়াদ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। সে চিৎকার করে বললো, 'তোমার স্পর্ধা মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে মুসলীম। আমীরুল মুমেনীন ইয়াজিদ সম্পর্কে কটুক্তি করে জঘন্য অপরাধ করেছো তুমি। এই জন্য তোমাকে কঠিনতম শাস্তি ভোগ করতে হবে। এমন শাস্তি তোমাকে আমি দেবো, যা দেখে কেউ আর কোনোদিন এ ধরনের কাজ করতে সাহস না পায়।'

মুসলীম ইবনে আকীল নির্বিকার। বললেন, 'মৃত্যুর মালিক রব্বুল আলামীন। তাঁর ইচ্ছাতেই জন্ম। তাঁর ইচ্ছাতেই মৃত্যু। তোমার হাতে যদি আমার মৃত্যু লিখা থাকে, তাহলে অবশ্যই তা সংঘটিত হবে। আর এজন্যে আমি ভীত নই। আল্লাহ্ই আমার সহায়। বরঞ্চ তোমার এই কুকীর্তি দেখে পৃথিবী জানবে, তুমি কতো নীচ আর কতো ঘৃণ্য তোমার মনোবৃত্তি।'

মুসলীমের ঔদ্বত্যপূর্ণ কথা শুনে ইবনে যেয়াদ আর স্থির থাকতে পারলো না। সে বোকায়র বিন ইমামুল আহমারীকে নির্দেশ দিলো, 'মুসলীম বিন আকীলকে হত্যা করো'।

নির্দেশ মোতাবেক ছাদের উপর নিয়ে যাওয়া হলো মুসলীমকে এবং হাজারো উদ্বিগ্ন জনতার সামনে শিরোচ্ছেদ করা হলো তাঁর। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রজিঊন। ৬ হিজরীর ৯ই জিলহজ্জ ওবায়দুল্লাহ বিন যেয়াদের হুকুমে তার সৈন্যদের হাতে তিনি শাহাদাতবরণ করলেন। হজরত ইমাম হোসেন রা. মক্কা ছেড়ে তখন বেশ অনেকখানি কুফার পথে এগিয়ে গেছেন।

কাফেলা এগিয়ে চলেছে। ঘোড়ার খুরের আঘাতে আঘাতে পেছনে তৈরী হচ্ছে বালির মেঘ। দমকা বাতাসে মাঝে মাঝে আবার তা হারিয়েও যাচ্ছে দিগন্তের প্রান্ত সীমায়।

এগিয়ে চলেছে হজরত ইমাম হোসেনের কাফেলা কুফার পথে। এগিয়ে চলেছে অনন্ত আশা বুকে নিয়ে। মুসলীম ইবনে আকীল তার পক্ষ হয়ে কুফাবাসীদের বায়াত গ্রহণ করেছেন। আঠার হাজার ছাড়িয়ে হয়তো আরো অগুণিত কুফাবাসী তাঁর পক্ষ সমর্থনে এগিয়ে এসেছে। এতোদিনে হয়তো এক বিরাট মুসলীম বাহিনী তার পক্ষে প্রাচীর তৈরী করে ফেলেছে। এদের নিয়েই তিনি অত্যাচারী, নিষ্ঠুর ইয়াজিদকে দমন করে দেশে আবার শান্তির স্রোতধারা প্রবাহিত করবেন।

রাজতন্ত্রের মোহ যাদের মনে শেকড় গেড়েছে, তাদের সমূলে উৎপাটিত করে খোলাফায়ে রাশেদিনের অতুলনীয় নীতির ছায়াতলে সমস্ত মুসলীম বিশ্বকে একত্রিত করবেন। হজরত রসুলে মকবুল স. যে নীতিতে দেশ জাতি ও সমাজকে গড়ে তুলেছেন তারই পবিত্র সলিলে সবাইকে অবগাহন করাবেন। সব হানাহানি বন্ধ হবে। বন্ধ হবে ভাইয়ে ভাইয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা। বন্ধ হবে হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার অপচেষ্টা। সবাই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আবার এগিয়ে যাবে আল্লাহ্‌র নির্দেশিত পথে। শান্তির পবিত্র বাণী আবার ছড়িয়ে পড়বে দিক হতে দিগন্তে।

শিশুদের মুখে ফুটবে হাসি। কিশোরদের মনে জ্বলবে আশার আলো। যুবকদের মনে জাগবে নতুন দিনের রঙিন ছবি আর বৃদ্ধদের মনে দুলে উঠবে অতীত দিনের দুঃখ সুখের হাজারো কাহিনী। আপামর জনতার মুখে উচ্চারিত হবে কোরআন পাকের সেই শাশ্বত বাণী 'যা আল হাক্কু ওয়া যা হা কাল্ বাতিলু ইন্নাল বাতিলা কানা যাহুকা।' সত্য এসেছে, মিথ্যা নির্মূল হয়েছে। নিঃসন্দেহে মিথ্যা নির্মূল হয়ে থাকে।

কিন্তু সবই যেনো হঠাৎ ঝড়ো হাওয়ার ঝাপটায় ছেঁড়া মেঘের মতো ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। কাফেলা 'বারুদ' নামক স্থানে পৌঁছতেই যে সংবাদ হজরত ইমাম হোসেন রা. জানতে পারলেন, তাতে ক্ষণেকের জন্যে হলেও স্থির হয়ে গেলেন একেবারে।

দূত মুখে তিনি জানতে পারলেন, মুসলীম ইবনে আকীল ওবায়দুল্লাহ্ বিন যেয়াদের হাতে নিষ্ঠুরভাবে নিহত হয়েছেন। নিহত হয়েছেন হানী ইবনে ওরওয়াহ্, আবদুল্লাহ ইবনে বরকত। হানীকে প্রাণ দিতে হয়েছে ইবনে আকীলকে আশ্রয় দেবার অপরাধে। আবদুল্লাহকে প্রাণ দিতে হয়েছে মুসলীমের হত্যাকে সমর্থন না করার জন্যে। অথচ আশ্চর্য, এতো বড় নিষ্ঠুরতার কেউ কোনো প্রতিবাদ করেনি। গাছের একটি পাতাও নড়েনি। নদীতে একটা ঢেউও জাগেনি। সবাই এই অবিচারকে নতমস্তকে মেনে নিয়েছে।

কাফেলার গতি রুদ্ধ করলেন হজরত ইমাম হোসেন রা.। না। এভাবে এগিয়ে যাওয়া উচিত হবে না তাঁর। তিনি যা মনে করেছিলেন এখন বুঝতে পারছেন, তা

হবে না। কুফার একটি প্রাণীও তার পক্ষ হয়ে কথা বলবে না। ভীত সন্ত্রস্ত মেষশাবকের মতো সেখানকার সব নেতা উপনেতারা নিজেদের গুটিয়ে নিয়েছে। তাদের মেরুদণ্ডহীন মনোভাবে সাধারণ জনগণ আত্মরক্ষার প্রয়োজনে অন্য সুরে কথা বলতে শুরু করেছে। যে হাত ইবনে আকীলের হাতে স্থাপন করে বায়াত গ্রহণ করে সত্য পথে জেহাদ করার জন্য প্রতিজ্ঞা করেছিলো, সেই হাতই মুহূর্তে ওবায়দুল্লাহ বিন যেয়াদের হাতে স্থাপন করে সেই সব প্রতিজ্ঞা ভুলে বসে আছে।

তাহলে এখন কি করা দরকার? নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করলেন হজরত হোসেন। এগুবেন না পিছুবেন তিনি? এগিয়ে যাওয়া মানে নিশ্চিত মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা। আর পিছানো মানেই হচ্ছে সত্যকে পাশ কাটিয়ে উটের মতো বালিতে মুখগুঁজে মিথ্যে সান্ত্বনা খোঁজা। সোজা কথায় সত্যের পথে জেহাদ না করে আত্মরক্ষা করার অপচেষ্টায় নিজ চরিত্রকে কলুষিত করা।

কোনটা করবেন তিনি? কোনটা? দো-টানায় পড়লেন হজরত। সঙ্গীদের অনেকে এ সময় বললেন– 'হজরত এখনও সময় আছে। আপনার এবং আপনার পরিবারবর্গের' নিরাপত্তার প্রয়োজনে আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে অনুরোধ করছি, ফিরে চলুন। মনে হচ্ছে কুফায় আপনার পক্ষে কথা বলার মতো একজনও নেই। সংঘর্ষ হলে তারা আপনার বিরুদ্ধেই অস্ত্র ধারণ করবে।'

বোধ হয় ফিরে যাওয়াই উচিত। মনে মনে ভাবলেন তিনি। তারপর মুসলীম ইবনে আকীলের আত্মীয়স্বজনদের দিকে তাকিয়ে তাদের মনোভাব জানতে চাইলেন।

- না আমরা ফিরে যেতে চাই না।

তীব্র কণ্ঠে প্রতিবাদ জানালেন ইবনে আকীলের আত্মীয় স্বজন। তাঁরা বললেন, 'হয় প্রতিশোধ গ্রহণ করবো, নয়তো ভাইয়ের মতো আমরাও জীবন দিবো।

তাদের কথা শুনে হজরত ইমাম হোসেনের বুক ভেদ করে একটা দীর্ঘশ্বাস বের হয়ে এলো। কিছুই করার নেই তাঁর। যাঁরা স্বেচ্ছায় ভাইয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ করতে চান, অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে চান, তাঁদের তিনি বাঁধা দেবেন কিভাবে? কিভাবে বলবেন, তোমরা সত্যের জন্য জেহাদ করো না। না, তিনিতো তাদের তা বলতে পারেন না। সুতরাং এগিয়ে যেতে হবে। এগিয়ে যেতে হবেই। যতক্ষণ পর্যন্ত মঞ্জিলে পৌঁছানো না যায় ততক্ষণ কাফেলা চলতেই থাকবে।

তিনি সঙ্গীদের সবার উপরে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিলেন। তারপর আপন মনেই বললেন, 'এ জীবনে আর স্বাদ নেই।'

কাফেলা এগিয়ে চলে। রাতের বেলা চাঁদ শ্বেতশুভ্র আলো ছড়িয়ে দেয় নবী করীম স. এর ফরজন্দ আর তাঁর সঙ্গী সাথীদের মাথায়। হীমশীতল বাতাস ক্লান্ত অবসন্ন দেহে বুলিয়ে দেয় শান্তির মোহনীয় পরশ। সারা দিনের আগুনঝরা সূর্যের রুদ্র রোষ, উত্তপ্ত বালুভূমির অসহনীয় উত্তাপ আর লু-হাওয়ার আকস্মিক ঝাপটা হতাশা'র পাহাড় গড়ে তোলে প্রতিটি যাত্রীর মনের গভীরে। রাত এলে তা আবার গলে গলে নিঃশেষ হয়ে যায়। পরদিন আবার নতুন উদ্যমে শুরু হয় পথ চলা।

মুয়াজ্জিনের কণ্ঠে 'আস্‌সালাতু খায়রুম মিনান নাউম' এর হৃদয় উদ্বেল করা আহবান, নহরের নীরে আকণ্ঠ অবগাহন করার মতোই এক অবর্ণনীয় তৃপ্তিতে ভরে তোলে মন-প্রাণ সমস্ত দেহ। দূর হয়ে যায় ক্লান্তি। দূর হয়ে যায় সব অবসাদ। রহমানুর রহিমের সান্নিধ্য কামনায় কাতার বন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে সবাই। নতজানু হয় মাবুদের দরবারে হৃদয় উজাড় করে দিয়ে। তারপর পূর্ব আকাশ যখন শহিদী খুনের মতো ধীরে ধীরে রাঙা হয়ে উঠতে থাকে, তখন আবার শুরু হয় পথ চলা। কখনো অসমান উষর প্রান্তর। কখনো ধূসর মরুভূমি। কখনো দুর্গম পাহাড়ী উপত্যকা। আবার কখনো বুক কাঁপানো গিরি খাত পার হয়ে কাফেলা এগিয়ে চলে বিরামহীন, একটানা।

হজরত ইমাম হোসেন রা. তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেন, সঙ্গী সাথী বেশ জুটেছে। পথে বেদুইনরা দলে দলে এসে কাফেলায় শরিক হয়েছে। ক্ষুদ্র কাফেলা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়েছে। সবার বুকে আশা, হজরত ইমাম হোসেনের সাথে গিয়ে ইরাকে শান্তিতে বসবাস করবে। বিশেষ করে বেদুইনদের মনের ইচ্ছা তাই। শান্তি চাই। স্বস্তি চাই। হজরত ইমাম হোসেনের সাথে গেলে নিশ্চয়ই ঠাঁই পাওয়া যাবে। নিরাপত্তা পাওয়া যাবে। পাওয়া যাবে নিশ্চিন্ত জীবনের স্বাদ।

কিন্তু তিনিতো জানেন, পরিস্থিতি ধীরে ধীরে যে দিকে মোড় নিচ্ছে, তাতে জীবনের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা কতোটুকু? হতাশার কালো মেঘ ক্রমেই চারদিক থেকে যেভাবে ঘনিয়ে আসছে, তাতে যে কোনো মুহূর্তে উত্তপ্ত হয়ে উঠতে পারে পরিবেশ। হঠাৎ দমকা বাতাসের আঘাতে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যেতে পারে শান্তি, স্বস্তি, আর আশা আকাঙ্খার কাল্পনিক প্রাসাদ।

তাই তিনি জাবালা নামক স্থানে পৌঁছে ভাবলেন, এবার নিষ্ঠুর সত্য কথাটাই তাঁর সঙ্গী সাথীদের জানিয়ে দেওয়া উচিত। তাতে যদি কেউ এই বিপদসংকুল

পথের কথা ভেবে এবং ভবিষ্যৎ পরিস্থিতি অনুধাবন করে সাথে যেতে চায় তাহলে কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু মিথ্যা মোহের টানে যেনো না যায় কেউ।

এ কথা চিন্তা করেই তিনি সবাইকে ডেকে বললেন, 'আমার প্রিয় সাথীরা, আমি এক দুঃখজনক সংবাদ পেয়েছি। মুসলীম ইবনে আকীল, হানী ইবনে ওরওয়াহ্ এবং আবদুল্লাহ ইবনে বরকত কুফায় নিষ্ঠুরভাবে শাহাদাতবরণ করেছেন, আর তাঁদের মৃত্যুর জন্য দায়ী যারা, তারা আমাদেরই লোক। তারা আমাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। সুতরাং আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছি কুফায় এই মুহূর্তে আমাদের পাশে দাঁড়াবার মতো কোনো লোক নেই। দুশমন আছে যথেষ্ট, এ অবস্থায় কেউ যদি নিজের নিরাপত্তার জন্য অনত্র চলে যেতে চান তাহলে নির্দ্বিধায় যেতে পারেন। আমি এজন্যে অসন্তুষ্ট হবো না।'

হজরত ইমাম হোসেনের কথা শুনে বেদুইনরা থমকে গেলো। নিশ্চিন্ত জীবনের আশার আলো তাদের চোখ থেকে দপ করে নিভে গেলো মুহূর্তেই। পিছু হটতে শুরু করলো তারা। কিছুক্ষণ পরে দেখা গেলো, একমাত্র আপন পরিবার ছাড়া আর কেউ তাঁর পাশে নেই।

এটাই নিয়ম তিনি তা জানতেন। বেদুইনরা আত্মত্যাগের মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে যে এই কাফেলায় শরীক হয়নি তা পরিষ্কার হয়ে গেলো এবার। হজরত ইমাম হোসেন রা. একটুও বিচলিত হলেন না। তিনি তাঁর পরিবার পরিজনদের উপর দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে আবার এগিয়ে চললেন সামনের দিকে।

এভাবেই এক সময় আকাবা এসে পৌঁছলো কাফেলা। ক্ষণিকের জন্য বিশ্রাম। তারপর পথ চলার প্রস্তুতি। এখানেই বনু একরামা গোত্রের এক ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ হলো। তিনি হজরত হোসেন রা.কে বললেন, 'হজরত, আপনি আর সামনে না এগিয়ে ফিরে যান। কারণ, এখন আর আপনার পথ নিরাপদ নয়। যতোই এগিয়ে যাবেন ততোই বর্শা, বল্লম ও তরবারীর সাথে আপনাকে মোকাবেলা করতে হবে। ইরাকের গভর্ণর কাদেসিয়া থেকে আবিব পর্যন্ত সৈন্য মোতায়েন করে রেখেছে। আপনি একবার সেই ফাঁদে পা দিলে আর বেরিয়ে আসতে পারবেন না।'

হজরত ইমাম হোসেন কিছুমাত্র বিচলিত হলেন না। তিনিতো মুসলীম, হানী এবং আবদুল্লাহ্র মৃত্যুসংবাদ পাওয়ার পরই বুঝতে পেরেছেন, শত্রুর সাথে তরবারীর মোলাকাত না হওয়া পর্যন্ত পেছনে ফেরা যাবে না। তিনি লোকটিকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'ভাগ্যের লিখন কেউ খণ্ডাতে পারে না। তকদীরের নিকট সমর্পণ করাই এখন আমার কর্তব্য।'

পথ চলা শুরু হলো পুনরায়।

কাদেসিয়া ছেড়ে সামনে কিছুদূর এগিয়ে শারাফ নামক স্থানে বিশ্রামের কথা চিন্তা করলেন ইমাম হোসেন রা.। আদেশ দিলেন যাত্রীদের, 'তাঁবু খাটাও। বিশ্রাম নাও। তারপর আবার শুরু হবে পথ চলা।'

হুকুম পেয়ে সবাই হাতে হাতে শুরু করলেন তাঁবু খাটানোর কাজ। অন্তরে আনন্দের হিল্লোল। আহ্! এবার একটু স্বস্তি পাওয়া গেলো। পাওয়া গেলো একটু শান্তি। দীর্ঘ যাত্রাপথে একটু নিশ্চিন্ত বিশ্রামের। বিশ্রামের আশায় যখন সবাই উদ্বেল তখন হাঠাৎ দেখা গেলো দূর দিগন্ত রেখায় জমে উঠেছে ধূলোর মেঘ।

সাথে সাথে বুঝে ফেললো সবাই, শত্রুপক্ষ আসছে। আসছে মৃত্যুর পতাকা হাতে নিয়ে।

হজরত ইমাম হোসেন রা. নিজেও বুঝলেন ওই ধূলোর মেঘের আড়ালে কারা আসছে। তাই অপেক্ষা না করে তাঁর সঙ্গীদের আবার বললেন, এখান থেকে সরিয়ে সামনের ওই পাহাড়ের পাদদেশে তাঁবু খাটাও। মোকাবেলা যদি করতেই হয়, তাহলে বাঁয়ের এবং পেছনের পাহাড়ী পথ নিরাপদ থাকবে।

যোহায়ের বিন কাইয়েন পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি হোসেনের সিদ্ধান্তকে সমর্থন দিয়ে বললেন, 'আপনি ঠিকই বলেছেন, বাঁয়ে এবং পেছনে আমরা সত্যিই নিরাপদ। ডানে এবং সামনে থেকেও ওরা বেশী সুবিধা করতে পারবে না।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই দিগন্তের ধূলির মেঘ কাছে এসে পৌঁছলো। ধূলি মেঘ সরে গেলে দেখা গেলো, একহাজার অশ্বারোহীর একবাহিনী নিয়ে হোর ইবনে ইয়াযিদ সামনে দাঁড়িয়ে। ইরাকের গভর্ণর ওবায়দুল্লাহ্ বিন যেয়াদের নির্দেশে হোর এসেছে এখানে। সে এসেছে ইমাম হোসেন রা.কে যে কোনো মূল্যে ইবনে যেয়াদের দরবারে হাজির করার জন্যে। ইমাম হোসেন রা. যদি অন্য পথে যাবার চেষ্টা করেন তাহলে বাধা দিতে হবে অর্থাৎ কোনো অবস্থাতেই তাকে হাতছাড়া না করার জন্য হোরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

হাজার সৈন্যের অধিনায়ক হোর তার বাহিনী নিয়ে ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে এসে হজরত ইমাম হোসেন রা. এর তাঁবুর সামনে তার তাঁবু খাটানোর নির্দেশ দিলো। সৈন্যরাও মুহূর্তের মধ্যে দু'দিক ঘিরে তাঁবু স্থাপন করলো। দেখতে দেখতে যোহরের নামাজের সময় হয়ে এলো। মুয়াজ্জিনের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে উঠলো সেই চিরবিজয়ী বাণী– আল্লাহু আকবার.....আল্লাহ্ মহান, আল্লাহ্ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই, মোহাম্মদ স. আল্লাহ্র রসুল..... হে আল্লাহ্র বান্দা তোমরা কল্যাণের পথে এসো আর আল্লাহ্র একত্ববাদকে ঘোষণা করো.....লা–ই-লাহা–ইল্লাল্লহ্--

দিক হতে দিগন্তে, পাহাড়ে পর্বতে, ধূলি ধুসরিত প্রান্তরে ছুটে চললো এই মহান বাণী। প্রাণ থেকে প্রাণে, হৃদয় থেকে হৃদয়ে ছড়িয়ে পড়লো সেই অন্তহীন

আহবানের উদাত্ত অনুরণন। শুরু হলো অবনত মস্তকে, একান্ত বিনয়ী চিত্তে রব্বুল আলামীনের দীদার লাভের প্রস্তুতি– নামাজ।

হজরত ইমাম হোসেন রা. পোশাক পালটিয়ে সাধারণ লুঙ্গি পরলেন, চাদর গায়ে দিলেন এবং পায়ে জুতা পরে হোরের সৈন্যদের সামনে গিয়ে বললেন, 'বন্ধুরা আমার, আল্লাহ্ জানেন, তোমরাও জানো আমি এখানে স্বইচ্ছায় আসিনি। তোমাদের একটার পর একটা চিঠি আমার কাছে গেছে। তোমাদের কাসেদ আমার কাছে তোমাদের সংবাদ পৌঁছিয়েছে। প্রত্যেকটা চিঠিতে তোমরা আকুল আবেদন জানিয়েছিলে আমার কাছে। লিখেছিলে অধীর আগ্রহে আমার জন্যে অপেক্ষা করছো তোমরা। আমি এলে আমার হাতে হাত রেখে সম্মিলিতভাবে সত্যের পথে এগিয়ে যাবার শপথ নেবে সবাই।

বন্ধুরা, আমিতো এসেছি। তোমাদের আহবানকে তো আমি উপেক্ষা করিনি। বরঞ্চ এটাকে আমার দায়িত্ব ও কর্তব্য বলে মনে করে সমস্ত বাধা বিপত্তি উপেক্ষা করে এগিয়ে আসতে দ্বিধা করিনি। এবারে তোমরা তোমাদের কথা রক্ষা করো। এসো, আমরা একত্রিত হয়ে শহরে প্রবেশ করে আমাদের দাবী প্রতিষ্ঠা করি। আর যদি আমার এখানে আসা তোমাদের পছন্দ না হয়ে থাকে যদি মনে করো তোমরা যা বলেছো তা সত্য নয়, সাময়িক আবেগের বশে তোমরা তা করেছো, তাহলে সে কথাও আমাকে জানিয়ে দাও। আমি কোনো অভিযোগ করবো না। দাবীও রাখবো না তোমাদের উপর। এই দীর্ঘপথ পাড়ি দিতে যতো দুঃখ কষ্টই হোক না কেনো, আবার আমি যেখান থেকে এসেছি, সেখানেই চলে যাবো।'

হোর বাহিনীর সেনারা চুপচাপ দাঁড়িয়ে ইমাম হোসেনের বক্তব্য শুনে গেলো। কোনো মন্তব্য করলো না। কোনো প্রতিক্রিয়া তাদের মধ্যে দেখা গেলো না। চিঠিতে ইমামের প্রতি তাদের যে আবেগ ও আকুলতা, যে শ্রদ্ধা ও আনুগত্য প্রকাশ পেয়েছিলো তার ছিঁটেফোটাও এখন তাদের ওই চেহারায় দেখা গেলো না। চুপ করে রইলো সবাই।

হজরত ইমাম হোসেন রা. এবার হোর ইবনে ইয়াযিদকে বললেন, 'নামাজের সময় হয়েছে। আপনারা কি আলাদা নামাজ পড়বেন?

-'না, আমরা আপনার সাথেই নামাজ পড়বো। আপনি ইমামতি করুন।' হোর ইবনে ইয়াযিদ বিনয়ের সংগে উত্তর করলো। তারপর সবাই মিলে হজরত ইমাম হোসেনের ইমামতিতে নামাজ আদায় করলো। আছরের নামাজেও ইমাম হোসেন রা. ইমামতি করলেন।

আছরের নামাজের পর হজরত ইমাম হোসেন রা. আবারও হোরের সেনা বাহিনীর উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখলেন,

-'বন্ধুরা তোমরা যদি আল্লাহ্‌কে ভয় করো এবং খেলাফতের প্রকৃত দাবীদার যাঁরা, তাদের প্রতি অনুগত থাকো তবে রব্বুল আলামীনের সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারবে।

তোমরা নিশ্চয়ই জানো, আমরা রসুলুল্লাহ স. এর পরিবারবর্গ প্রকৃত খেলাফতের অধিকারী। যারা আজ নিজেদেরকে খেলাফতের ধারক ও বাহক হিসাবে ঘোষণা করেছে, প্রকৃতপক্ষে তারা কি অন্যায় করছে না? এখন এই অন্যায়কেই যদি তোমরা ন্যায় বলে মেনে নাও এবং আমার দিক থেকে যদি তোমাদের সমর্থন উঠিয়ে নাও, তবে তাও আমি হাসিমুখে মেনে নেবো। কোনো প্রতিবাদ না করে সন্তুষ্ট চিত্তেই ফিরে যাবো।'

হোর ইবনে ইয়াযিদ মুখ খুললো এবার। বললো, আমরা কোনো পত্র পাঠাইনি। কাউকে আহবানও করিনি।

বিস্মিত হলেন হজরত হোসেন রা.। সেই সাথে বুঝতে পারলেন ইবনে আব্বাস, ইবনে জাফর, কবি ফারাযদক যে কথা বলেছিলেন তাই সত্যে পরিণত হতে চলেছে। তিনি আর অপেক্ষা না করে তাঁবু গুটিয়ে কাফেলা চলবার জন্য হুকুম দিলেন।

বাঁধো সব সরঞ্জাম। তোলো উটের পিঠে। ওঠো সওয়ারী ঘোড়ায়। চলো আবার আমরা ফিরে যাই। যে আশা, যে আশ্বাস, যে প্রতিজ্ঞা জনে জনে প্রতি জনে উচ্চারণ করেছে বারবার, তার আর বিন্দুমাত্র চিহ্নও নেই কারো চোখে মুখে মনে। সবাই ভুলে গেছে তাদের ইমামকে। ভুলে গেছে তাদের নবীর ফরজন্দকে। ভুলে গেছে খেলাফতের প্রকৃত দাবীদারকে। সুতরাং আর প্রয়োজন নেই বীর কেশরী আলী হায়দার রা. এর সুযোগ্য সন্তানকে। যাঁরা আজীবন ত্যাগের মাধ্যমে গড়ে তুলেছিলেন ইসলামের সুদৃঢ় প্রাচীর। যাঁদের তলোওয়ারের আঘাতে আঘাতে শত্রুরা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলো। বিজয় ভেরী বেজে উঠেছিলো প্রতিটি যুদ্ধক্ষেত্রে রব্বুল আলামীনের অনুগ্রহে। তাদের আজ কোনো স্থান নেই। সমর্থন নেই। নেই এগিয়ে যাবার অধিকার।

সুতরাং চলো কাফেলা, ফিরে চলো।

কিন্তু ফিরে চলো বললেই তো যাওয়া যায় না। কাফেলা চলতে গিয়ে বাধা পেলো। হোর ইবনে ইয়াযিদ তার সৈন্যদের নিয়ে বাধা দিলো কাফেলাকে। হজরত হোসেন তাঁদের ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হলেন। রাগান্বিত স্বরে হোরকে লক্ষ্য করে বললেন, 'তোমার মা তোমার জন্যে কাঁদুক এটাই কি তুমি চাও?'

একথা শুনে হোরও উচ্চকণ্ঠে উত্তর করলো 'আপনি ছাড়া আমার মাকে উদ্দেশ্য করে কোনো কথা যদি অন্য কোনো আরব বলতো তাহলে আমি তাকে ক্ষমা

করতাম না। কিন্তু আপনার মা সম্পর্কে বিরূপ কোনো কথা আমার মুখে আসতে পারে না। তাই চুপ করে রইলাম।'

হজরত হোসেন রা. ক্ষণকাল চুপ করে থেকে হোরকে পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, 'তাহলে তুমি কি চাও আমার কাছে?'

বিনীত কণ্ঠে বললো হোর, 'আপনাকে ওবায়দুল্লাহ বিন যেয়াদের কাছে পৌঁছাতে চাই।'

হোরের কথা শুনে অবাক হলেন তিনি। বললেন, 'সে কি করে সম্ভব? আমি তো তার কাছে যাবো না।'

-'আমিও আপনাকে ছেড়ে দিতে পারি না হজরত।'

-'কি করবে তুমি?'

-'আপনার সাথে সাথে যাবো। কারণ, যুদ্ধ করার আদেশ আমাকে দেয়া হয়নি। তা-ছাড়া আরো নম্র ভঙ্গিতে হোর ইবনে ইয়াযিদ বললো, হজরত, আমি আপনাকে শ্রদ্ধা করি, আপনার সাথে কোনো প্রকার সংঘর্ষ বাঁধুক, তেমন পরিস্থিতিতে আল্লাহ্ যেনো আমাকে না ফেলেন।'

হোরের একথায় ইমাম হোসেন রা. কোনো উত্তর করলেন না।

হোর ইবনে ইয়াযিদ বললো, আপনি যদি একান্তই কুফা যেতে রাজী না হন, তাহলে কুফা এবং মদীনার পথ ত্যাগ করে তৃতীয় কোনো পথ আপনাকে ধরতে হবে। নইলে অস্ত্র ধরতে হবে।'

হজরত ইমাম হোসেন রা. বুঝলেন, হোর-এর কথাই তাঁকে মেনে নিতে হবে। নয়তো অস্ত্র ধরতে হবে। অথচ তিনিতো শত্রুর প্রতি প্রথম অস্ত্র ধরতে চান না। তাই তিনি বিরোধ এড়াবার জন্য তার কথাই মেনে নিয়ে কাফেলা পরিচালনার হুকুম দিলেন।

শুরু হলো অনিশ্চিত পথ যাত্রা। হোর এবং তার বাহিনীও পিছু পিছু অনুসরণ করে চললো। আগে আগে ইমাম হোসেন রা. এর কাফেলা আর তাঁকে বেষ্টন করে এগিয়ে চললো ইয়াজিদ বাহিনী।

কাফেলা চলছে আর চলছে। এক সময় রাত নামছে উত্তপ্ত মরুভূমিতে হিমশীতল মৃত্যুর পরওয়ানা নিয়ে। ক্লান্ত পরিশ্রান্ত কাফেলা থামছে সেখানে। তাঁবু পড়ছে বিশ্রামের জন্যে। আবার যখন লাল টিপ কপালে নিয়ে ভোরের আকাশ হেসে উঠছে, সুবহে সাদেকে ফজরের আজানের উদাত্ত আহবানে বালু-কঙ্কর আর নুড়ি পাথরের দুর্গম পথ মুখর হয়ে উঠছে তখন নামাজ শেষে আবার শুরু হচ্ছে পথ চলা। এ চলার যেনো যতি নেই। নদীর স্রোতের মতোই শুধু সামনে এগিয়ে চলা। এগিয়ে চলা নিরবচ্ছিন্ন গতিতে।

পেছনে বিষ ফোঁড়ার মত অনুসরণ করে আসছে হোরের নেতৃত্বে ইয়াজিদী বাহিনী। পথে পথে কাফেলা থামলেই হজরত নিজের ক্লান্তির কথা ভুলে গিয়ে বক্তৃতা করছেন অনুসরণকারী সেনাবাহিনীর উদ্দেশ্যে। কিন্তু মন যাদের ওবায়দুল্লাহ বিন যেয়াদ সীল করে দিয়েছে, তাদের তো কোনো প্রতিক্রিয়া হবার কথা নয়। তবুও ইমাম হোসেন রা. তাঁর চেষ্টার ত্রুটি করলেন না। বারযা নামক স্থানে এসে তাদের লক্ষ্য করে আরও একটি প্রাণস্পর্শী বক্তৃতা দিলেন তিনি। বললেন, 'বন্ধুরা আমার, রসুলে মকবুল স. বলেছেন, অত্যাচারী শাসক, সীমা লংঘনকারী বাদশাহ, সুন্নতে নবীর স. খেলাফকারী ব্যক্তিরা কখনোই দেশ, জাতি ও সমাজের মঙ্গল আনতে পারে না। তা-ছাড়া এতো অনাচার, এতো অবিচার দেখে শুনেও যারা তা নীরবে সহ্য করে কোনো প্রকার প্রতিবাদ না করে অবনত মস্তকে সবকিছু মেনে নেয়, আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন তাদেরকেও ক্ষমা করবেন না।

বন্ধুরা, দেখো, এরা জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ভুল পথে পা বাড়িয়েছে। এরা রহমানুর রহিমের হুকুম আহকামকে অবহেলা করে চলেছে। নিজ স্বার্থকে চরিতার্থ করার জন্য ন্যায়নীতিকে বিসর্জন দিয়ে অন্যায় ও অসত্যের পথে ছুটে চলেছে। গনিমতের মাল নিজের সম্পত্তি মনে করে ইচ্ছামত ব্যবহার করছে। হালালকে হারাম আর হারামকে হালাল করার চেষ্টা চলছে। খুন, রাহাজানি লুটতরাজ– মোট কথা অরাজকতা শুরু হয়েছে ব্যাপক হারে, যার ফলে সমাজ জীবন হয়ে পড়েছে অনিশ্চিত। কিন্তু এভাবে জীবনতো চলতে পারে না। চলতে পারে না কোনো দেশ, জাতি বা রাষ্ট্র। তোমরা জানো আল্লাহ্ সীমা লংঘনকারীকে পছন্দ করেন না।

সুতরাং বন্ধুরা, এখনও সময় আছে তোমরা বুঝে দেখো, তোমরা কি করবে? তাদের ধৃষ্টতা, উদ্ধত আচরণ, জুলুমবাজী ও অবিচার কি চলতে থাকবে, নাকি বন্ধ করতে হবে এবং যদি বন্ধ করতেই হয়, তাহলে এ দায়িত্ব আমি ছাড়া আর কেইবা নিতে পারে? যে দায়িত্ব নিতে পারে, খেলাফত দাবী করার অধিকারও তার অবশ্যই আছে। আমি জানি এ দাবী আমি করতে পারি। আর তাই আমার সামনে এগিয়ে আসা ছাড়া অন্য কোনো উপায় ছিলো না।

তোমাদের সাথে সাক্ষাৎ হবার পর থেকে আমি বহুবার বলেছি, আবারও বলছি, তোমাদের অসংখ্য চিঠি আমার হাতে এসেছে। সেসব চিঠি পড়ে আমার কখনো মনে হয়নি, যেসব প্রতিজ্ঞা তোমরা করেছিলে, পরবর্তীতে তাই আবার অবলীলায় অস্বীকার করে বসবে। এখনও সময় আছে, তোমরা তোমাদের পত্রের ওয়াদা স্মরণ করে যদি আমাকে সমর্থন দাও, তাহলে আমাদের পথ সাফল্যে ভরে উঠবে। কারণ আমি হজরত আলী রা. এবং খাতুনে জান্নাত ফাতেমাতুজ জোহরা রা. এর পুত্র। হজরত মোহাম্মদ স. এর দৌহিত্র। আমার কথা ও কাজে কখনই দ্বিমত প্রকাশ পেতে পারে না। আমার জীবন তোমাদের জীবনের সাথে এবং

আমার সন্তানেরা তোমাদের সন্তানদের সাথে এক হয়ে মিশে যাবার এইতো প্রকৃষ্ট সময়। এসো, তোমরা আমার এই আন্তরিক আহবানকে উপেক্ষা না করে শান্তির ও ন্যায়ের পতাকা তলে আশ্রয় নাও। অবশ্য যদি তা না করে আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও তাতেও আমার কিছু করার থাকবে না। কিছু বলারও থাকবে না। তবে নিঃসন্দেহে তা হবে দুঃখজনক। তোমরা যে খুব দ্রুত তোমাদের মনোভাব পাল্টাতে পারো, তোমাদের বর্তমান অবস্থা দেখে এখন তা আর অস্বীকার করার উপায় নেই।

তোমরা আমার আব্বা হজরত আলী রা., আমার ভাই হজরত হাসান রা. এবং আমার চাচাত ভাই মুসলীম ইবনে আকীল এর সাথেও প্রতারণা করেছো। আসলে কিন্তু তোমরাই প্রতারিত হয়েছো। মনে রেখো আল্লাহ্ জাল্লাজালালুহু তোমাদের এই হীন মানসিকতা কখনোই ক্ষমা করবেন না। তোমরা নিশ্চয়ই জানো, যারা প্রতারণা করে তারা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি সাধন করে।

আমি জানি আল্লাহ্ তোমাদের এই অশুভ বেষ্টনী থেকে আমাকে অবশ্যই রক্ষা করবেন। কারণ, আমার বিশ্বাস, আমি কখনোই বিপথগামী হইনি। এখন তোমাদের সিদ্ধান্ত নেবার সময় এসেছে, ভেবে দেখো, তোমরা কি করবে? আমার আর কিছুই বলার নেই। আস্সালামো আলাইকুম, ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারকাতুহু।'

হজরত হোসেন ইয়াজিদ বাহিনীর উদ্দেশ্যে দীর্ঘক্ষণ বক্তৃতা দিলেন। আগের মতো এবারো তাঁর এই বক্তৃতার কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা গেলো না। প্রতিক্রিয়া না হওয়ারই কথা। যাদের হৃদয় মন সত্যপথ থেকে দূরে সরে গেছে, তাদের কিইবা বলবার থাকতে পারে? তাছাড়া পাথর আর ওদের মধ্যে এখন বুঝি আর কোনো তফাৎ নেই। নইলে এই প্রাণস্পর্শী ভাষণ কোনো রক্ত মাংসের মানুষ উপেক্ষা করতে পারে? হজরত ইমাম হোসেন রা. দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে আবার সামনের দিকে কাফেলা পরিচালনার আদেশ দিলেন।

কাফেলা এগিয়ে চলেছে। এগিয়ে চলেছে শ্যামল প্রান্তর, শান্ত সমাহিত ধ্যানগম্ভীর পবর্তমালা পেরিয়ে। সামনে ধুধু বালি আর কংকরাকীর্ণ পথ। হজরতের কাফেলা ডানের আজীব ও কাদেসীয়ার পথ ছেড়ে বাঁয়ের পথ ধরে এগিয়ে চললো। সামনের পথ আরো বিপদসঙ্কুল, আরো দুর্গম। কাফেলার গতিও মন্থর হয়ে আসছে ধীরে ধীরে।

হজরত ইমাম হোসেন রা. বুঝতে পারছেন, বিপদ খুব বেশী দূরে নেই। যে কোনো সময় মানুষ রূপী হায়নার দল হিংস্র নখরাঘাতে ক্ষত বিক্ষত করে তুলতে পারে দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় ক্লান্ত অবসন্ন কাফেলার যাত্রীদের। ভাবতে গিয়ে হজরতের বুকের ভিতরটা তোলপাড় করে উঠলো। তবুও তিনি নিজেকে স্বাভাবিক

রাখতে চেষ্টা করলেন। কারণ, যারা তার দিকে তাকিয়ে আছে বিপদ দেখে তারা যেনো সাহস না হারায়।

আর কোনো উপায়ওতো নেই। আল্লাহ্ যা ভালো মনে করেন, তাই ঘটবে। আল্লাহ্র ইচ্ছাই তো তাঁর ইচ্ছা। আল্লাহ্র প্রতি একান্ত আত্মসমর্পণইতো তাঁর ব্রত। শুধু তিনি কেনো, কোনো মুসলমানই তো রব্বুল আলামীনের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে যেতে পারেন না। ধৈর্যধারণ করা এবং আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করাইতো মুসলমানের কর্তব্য। আল্লাহ্পাক বলেছেন, 'ধৈর্যধারণকারীকে সুসংবাদ দাও, তাদের উপর যখন বিপদ এসেছে, তারা বলেছে, নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহ্র জন্য এবং তার কাছেই ফিরে যাবো শেষাবধি। তাদের উপরে প্রতিপালকের তরফ থেকে অজস্র নেয়ামত ও রহমত বর্ষিত হবে।'

পথ চলতে চলতেই হজরত ইমাম হোসেন রা. আবারও হোর বাহিনীর উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখলেন।

'হে আল্লাহ্র বান্দাগণ, তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছো অবস্থা ও পরিস্থিতি ক্রমেই খারাপের পথে চলে যাচ্ছে। মানুষ মানুষের প্রতি অন্যায় আচরণ করছে। আঘাত হানছে পেছন থেকে। সত্য পরাজিত হচ্ছে বার বার। অসত্য আর শয়তানিয়াত অধিকার করে নিচ্ছে মানুষের কলব। হিংসা নিন্দা ঘৃণা মানুষের মাঝে ছড়িয়ে পড়ছে বিষবাষ্পের মতো। আর এখন সত্যকে রক্ষা করতে হলে মোমেনবান্দাগণের আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের আশ্রয় প্রার্থনা করা ছাড়া কোনো উপায় নেই। এসো হে সত্যপথযাত্রীগণ, আমরা আল্লাহ্র করুণা ভিক্ষা করি। নয়তো শহিদী মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে প্রস্তুত হই। কারণ, জালেমের সাথে বেঁচে থাকার মতো পাপ আর অন্য কোনো কিছুতেই নেই।

হজরত ইমাম হোসেনের হৃদয় মন উতলা করা আহবানে যোহায়ের বিন কাইয়েন আর স্থির থাকতে পারলেন না। হোর বাহিনী পূর্বের মতোই স্থির নিস্পৃহ মনোভাব নিয়ে অর্ধচন্দ্রাকারে এগিয়ে চলেছে। সামনে হজরত হোসেন, তাঁর পরিবারবর্গ ও সাথীবৃন্দ, পেছনে এবং দুই পাশে হোরের সুসজ্জিত সেনাবাহিনী।

হাজার সৈন্যের বাহিনী। নীরবে পথ চলেছে। ঘোড়ার খুড়ের আঘাতে ধূলি উড়ছে আকাশে, অশ্ব পদবিক্ষেপের হালকা আওয়াজ ছড়িয়ে পড়ছে বালুময় প্রান্তরে। মাঝে মধ্যে ক্লান্ত কাফেলায় জেগে ওঠে অশ্বের হ্রেষা রব। আগে পরে শুধু একটানা পদবিক্ষেপের নিস্প্রাণ আওয়াজ।

অসহ্য এই প্রাণহীন পথ যাত্রা। কতক্ষণ এভাবে পথ চলা যায়? সৈন্যরা যেনো মুখে তালা মেরেছে। প্রতিজ্ঞা করেছে, কোনো কথারই জবাব দেবে না তারা। কিন্তু যোহায়ের বিন কাইয়েন নিজেকে স্থির রাখতে পারলেন না। তিনি হোর বাহিনীর

উদ্দেশ্য বললেন, 'হজরতের এই যে আবেদন বার বার ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে, এই যে আকুল আহবান দিক হতে দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ছে, এ সবই কি নিষ্ফল হবে? তোমরা কি কোনো উত্তরই দেবে না? তোমাদের কি কিছুই বলার নেই?'

যোহায়ের বিন কাইয়েনের কথায় হোর বাহিনীর ভিতরে মৃদু আলোড়ন উঠলো। তাদের মধ্যে থেকে কে একজন এই প্রথম চিৎকার করে বললো, 'আমাদের কিছুই বলার নেই কাইয়েন। যদি কিছু বলার থাকে আপনিই বলুন।

-'ঠিক আছে তবে তোমরা শুনে রাখো, তোমাদের মুখে যখন এক স্বার্থবাদী ব্যক্তির নির্দেশের তালা চেপে বসেছে, তখন আমিই হজরতের কথার জবাব দিচ্ছি।'

যোহায়ের বিন কাইয়েন একটু থামলেন। চারিদিকে আরো একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে ইমাম হোসেন রা.কে উদ্দেশ্য করে উচ্চস্বরে বললেন, 'হে রসুলুল্লাহ্ স. এর ফরজন্দ, আল্লাহ্ আপনার সঙ্গী হউন। আমরা আপনার হৃদয় উৎসারিত বক্তৃতা শুনেছি। এই পৃথিবী যদি চিরস্থায়ী হতো এবং জীবন যদি হতো অনন্তকাল স্থায়ী তাহলেও আপনার সাথে মৃত্যুবরণ করতে দ্বিধা করতাম না।'

হজরত ইমাম হোসেন রা. যোহায়ের বিন কাইয়েন-এর এ কথার কোনো উত্তর দিলেন না। নীরবেই এগিয়ে চললেন।

যোহায়ের বিন কাইয়েন ছিলেন কুফার অধিবাসী। তিনি মক্কায় হজব্রত পালন করে ফেরার পথে বারুদ নামক স্থানে তাঁবু খাটিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। সেখানে একটু দূরে হজরত ইমাম হোসেন রা.ও তাঁবু খাটিয়ে বিশ্রামের ব্যবস্থা করেছিলেন।

তাঁবুতে যোহায়েরকে দেখে হজরত হোসেন তাঁকে কাছে আসতে ইশারা করলেন। কিন্তু হজরত ওসমান রা. এর একান্ত ভক্ত ও অনুসারী কাইয়েন তাঁর সাথে দেখা করতে ইতস্ততঃ করতে লাগলেন। কুফার অবস্থা তিনি দেখে এসেছেন। কুফাবাসী ইমাম হোসেন রা.কে মনে মনে সমর্থন করলেও প্রকাশ্যে সমর্থন করার সাহস দেখাবে না। কারণ তিনি জানেন, ইয়াজিদের নিযুক্ত কুফার গভর্ণর ওবায়দুল্লাহ বিন যেয়াদের ভয়ে তারা একরকম তটস্থ হয়ে থাকে। এই অবস্থায় কাইয়েন দেখা করবেন, না কি করবেন না, বুঝতে পারলেন না। কারণ, হজরত ইমাম হোসেনের সাথে দেখা করার অর্থ হিসেবে সবাই যদি ধরে নেয় যে, তিনি তাঁকে সমর্থন করেন। তাহলে তাঁর উপরে আঘাত আসতে পারে, জীবন বিপন্ন হয়ে পড়তে পারে, এমন কি মৃত্যুও হতে পারে। তাই তিনি হোসেন রা. এর আহবানকে এড়িয়ে যেতে চাইলেন।

যোহায়ের এর স্ত্রী স্বামীর এই মানসিকতাকে সমর্থন করতে পারলেন না। যেই মহামানব নিজের জন্য নয়, একটা ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর জন্যও নয়, এমনকি তার পরিবার

পরিজনদের জন্যও নয়, দেশ জাতি ও সমাজের মঙ্গলের জন্য মুসলিম-গৌরব ও রসুলুল্লাহ স. এর নীতি ও আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য সমস্ত বিপদকে তুচ্ছ করে এগিয়ে চলেছেন সামনের দিকে, সেদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখলে আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন কি ক্ষমা করবেন? তাই তিনি স্বামীকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'আওলাদে রসুলের আহবানকে আপনি কেমন করে উপেক্ষা করছেন? যাঁর আকাশের মতো উদার হৃদয়ের স্পর্শ পেয়ে আপনি মুসলমান হবার গৌরব অর্জন করেছেন, তাঁরই কলিজার টুকরা, আত্মার আত্মীয়, প্রিয় দৌহিত্রের আহবানকে আপনি অস্বীকার করছেন কি করে? আপনি তো পুরুষ মানুষ। আপনার তো ইবনে যেয়াদের ভয়ে নিশ্চুপ থাকা উচিত নয়।

স্ত্রীর কথায় যোহায়ের বিন কাইয়েন এর মনের দ্বিধা দ্বন্দ্ব মুহূর্তে দূর হয়ে গেলো। সে ভাবলো, সত্যিই তো, মানুষ তো একবারই মরণের স্বাদ গ্রহণ করে থাকে। আর মুসলমান যে, সেতো মরণকে ভয় করতে পারে না। কারণ, তার একমাত্র মালিক রব্বুল আলামীন। কাইয়েন আর কোনো দ্বিধা না রেখে সিদ্ধান্ত নিলেন, 'যা হবার হবে। হজরত ইমাম হোসেনের সাথেই থাকবেন তিনি। তাতে যদি মরণ আসে আসবে। সে মরণ হবে গৌরবের, সম্মানের এবং মর্যাদার।'

যোহায়ের তাঁর তাঁবু হজরত ইমাম হোসেনের তাঁবুর পাশে এনে খাটালেন এবং লজ্জিত কণ্ঠে বললেন, 'হজরত আমি ভুল করেছি, আমাকে ক্ষমা করুন। এখন থেকে আমৃত্যু আমি আপনার পাশে পাশেই থাকবো ইনশাআল্লাহ্।'

হজরত হোসেন রা. ইবনে কাইয়েনের কথা শুনে মৃদু হাসলেন। তারপর আল্লাহ্ গাফুরুর রহিমের উদ্দেশ্যে পবিত্র দু'হাত তুলে তাঁর জন্যে প্রাণ খুলে দোয়া করলেন।

যোহায়ের তাঁর সাথীদের লক্ষ্য করে আনন্দ উদ্বেলিত কণ্ঠে বললেন, 'ভাইয়েরা আমার, আমি এখন থেকে হজরত ইমাম হোসেনের পক্ষ সমর্থন করছি। তাঁর পাশে থেকে সত্যের জন্যে সংগ্রাম করতে চাই। যদি শাহাদাত বরণ করি তবুও নিজেকে ভাগ্যবান মনে করবো। তোমরা যদি সত্য পথে থাকতে না চাও, আত্মত্যাগ করতে ভয় পাও তাহলে আমার সঙ্গ ত্যাগ করতে পারো।'

যোহায়েরের সাথীরা অবাক হয়ে ভাবলো, এর মাথা একেবারেই খারাপ হয়ে গেছে, নইলে আগুন দেখেও কি কেউ তার মধ্যে ঝাঁপ দিতে পারে। মুহূর্ত দেরী না করে তাঁর সাথীরা তাঁকে ছেড়ে চলে গেলো। যোহায়ের স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে তখন থেকেই হজরত ইমাম হোসেনের কাফেলার সাথে চলতে শুরু করলেন।

হোর বাহিনী হজরত ইমাম হোসেনের কাফেলাকে অনুসরণ করে আসছে। সেই সাথে কৌশলে দু'পাশ থেকে এমনভাবে বেষ্টন করে আসছে যেনো হজরত ইচ্ছা করলেও বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে পথ চলতে না পারেন এবং প্রয়োজনে হোর বাহিনী যেনো ত্বরিতগতিতে সম্মিলিতভাবে কাফেলার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে পরিস্থিতি নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতে প্রচণ্ড বেগে আঘাত হানতে পারে।

হজরত হোসেন রা. হোর বাহিনীর ব্যবহারে মনে মনে বিরক্ত হলেও মুখে কিছু না বলে নীরবে পথ চলছিলেন। কিন্তু হোর ইবনে ইয়াযিদ তাঁকে লক্ষ্য করে এমন সব কথা বলতে লাগলো যেনো তিনি বাধ্য হয়ে তার কথার প্রতিউত্তর করেন। হোর বললো, 'হে রসুলের ফরজন্দ, আপনি আপনার সমূহ বিপদ থেকে রক্ষা পাবার জন্য আল্লাহ্‌কে স্মরণ করুন। আমি জোর দিয়ে বলতে পারি, আপনি যুদ্ধ করতে চাইলে নিশ্চিত মৃত্যুবরণ করবেন।'

হোর-এর এ ধরনের অভদ্র কথা শুনে হজরত ইমাম হোসেন রা. এবার আর চুপ থাকতে পারলেন না। বিরক্ত হয়ে কঠোর কণ্ঠে বললেন, 'তুমি আমাকে মরণের ভয় দেখাচ্ছো হোর। তোমার মতো হতভাগা আমাকে খুন করতে চায়। কি আশ্চর্য! আমি কিছুই বুঝতে পারছি না, তবে এই মুহূর্তে রহমাতুললিল আলআমীনের একজন সাহাবীর উক্তি আমার মনে পড়ছে। তিনি তাঁর ভাইয়ের হুমকীর জবাবে বলেছিলেন,-

-'আমি যাচ্ছি। পুরুষদের জন্য মৃত্যু অপমানজনক কিছু নয়। বরঞ্চ জেহাদে মৃত্যুবরণ করা অতীব গৌরবের। হৃদয়ে যদি সৎ উদ্দেশ্য থাকে তাহলে ইসলামের জন্য জেহাদ করা প্রতিটি মুসলমানের একান্ত কর্তব্য।'

এ সময়ে কুফার দিক থেকে চারজন লোককে উটে চড়ে আসতে দেখা গেলো। তাদের সামনের জন তোরমাহ্ বিন আদী কবিতা আবৃতি করছিলেন।

'হে আমার উট তুমি ভয় পেয়ো না। ভোর হবার আগেই সাহসের সাথে এগিয়ে চলো তোমার শ্রেষ্ঠ আরোহীকে বহন করে। সামনেই তুমি এমন একজন মহৎ প্রাণ মানবের দেখা পাবে যিনি বংশ গৌরবে এবং সম্মানেই শ্রেষ্ঠ নন, তিনি যেমন স্বাধীনচেতা তেমনি বিশাল হৃদয়ের অধিকারী। আল্লাহ্ তাঁকে নিরাপদে রাখুন, কারণ তিনি এমন এক মহত্তম কাজের জন্য এগিয়ে চলছেন যা আল্লাহ্ নিজেও পছন্দ করেন।

হজরত ইমাম হোসেন রা. আদীর কবিতা পাঠ মনোযোগ দিয়ে শুনে মন্তব্য করলেন, 'জয় অথবা পরাজয় এবং মৃত্যু– যাই আসুক না কেনো, আমি বিশ্বাস করি আল্লাহ্ যা করবেন, সবই আমাদের কল্যাণের জন্য।'

হজরত হোসেনের কথা শুনে হোর বাধা দিয়ে বললো,-এরা কুফা থেকে আসছে। আপনার সমর্থক এরা নয়। আমি এদের আপনার কাছ থেকে দূরে রাখবো এবং ফিরে যেতে বাধ্য করবো।'

-'না, তুমি তা পারবে না। হজরত দৃঢ় কণ্ঠে উত্তর করলেন, 'তুমি আমার সাথে প্রতিজ্ঞা করেছো ইবনে যেয়াদের কাছ থেকে কোনো চিঠি না আসা পর্যন্ত আমার কাজে বাধা দেবে না।'

-'এরা আপনার সাথী নয়।'

-'আমি জানি তারা আমার সাথী ছিলো না। কিন্তু এখন তারা তাই। আমি তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি হোর, যদি তুমি এদের সাথে দুর্ব্যবহার করো তাহলে তোমার সাথে আমার যুদ্ধ করা ছাড়া কোনো উপায় থাকবে না।'

হোর হজরত ইমাম হোসেনের এই বক্তব্য শুনে তোরমাহ বিন আদী ও তার সঙ্গীদের বাধা দিতে সাহস করলো না। তোরমাহ ও তার সাথীরা ইমাম হোসেনের কাছে এগিয়ে এলো। হজরত তাদের কাছেও কুফার অবস্থা জানতে চাইলেন।

-'কুফার অবস্থা?' তোরমাহ্ হজরত হোসেনের কথার জবাব দিতে গিয়ে থমকে গেলেন। ভাবলেন, আহা। এই মানুষ জীবনকে কি কিছুই মনে করেন না? কুফার অবস্থাতো তাঁর না জানার কথা নয়। ওবায়দুল্লাহর তরবারীকে ভয় করে না এমন একজন মানুষও হয়তো এখন আর কুফায় খুঁজে পাওয়া যাবে না– একথা তো বাতাসের আগেই চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। তাহলে জেনে শুনেও জ্বলন্ত আগুনের মাঝে নিজেকে কেনো নিক্ষেপ করতে চাইছেন তিনি? তোরমাহ ইতস্ততঃ করে পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন,-

-জনাব, সত্যিই কি আপনি কুফার অবস্থা জানেন না? আল্লাহ্র কসম। আমি অনেক খুঁজেও আপনার পক্ষের একজন সমর্থক খুঁজে পাইনি। শুধু তাই নয়, আপনি তো দেখছেন, এখানে যারা আপনার কাফেলা বেষ্টন করে আছে, শুধু তারাই যদি একযোগে আক্রমণ করে, তাহলেই আপনার পরিবার পরিজনদের আত্মরক্ষা করা অসম্ভব হয়ে পড়বে। তাছাড়া কুফার সীমান্তে যে সৈন্য মোতায়েন করা হয়েছে, তারাও আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যই অপেক্ষা করছে। ওরা সংখ্যায় এতো বেশী যে, ধারণা করাও কঠিন। আল্লাহ্র দোহাই, আপনি সামনে আর এগুবেন না। তার চেয়ে আমার সাথে চলুন। আপনাকে আমি নিরাপদে 'আজা' পর্যন্ত নিয়ে যাবো।

একটানা এতোগুলো কথা বলে তোরমাহ্ থামলো হোসেনের জবাব শোনার জন্য। কিন্তু তিনি কোনো কথাই বললেন না। তোরমাহ্ হজরত হোসেনের মৌনতাকে সম্মতির লক্ষণ মনে করে দ্বিগুণ উৎসাহে বলতে লাগলেন, আল্লাহ্র কসম, দশ দিনের মধ্যে ত্বায় গোত্রের বিশ হাজার বীর সেনারা আপনার পক্ষে তলোয়ার ধরবে। প্রয়োজনে হাসিমুখে মরণকে বরণ করবে কিন্তু আপনার পবিত্র দেহে একটু আঁচড়ও লাগতে দেবে না।

তোরমাহ্-এর কথা শুনে হজরত হোসেন রা. ধীর কণ্ঠে বললেন, 'রব্বুল আলামীন তোমাকে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দিন। কিন্তু আমি যে হোরের সাথে চুক্তি করেছি। তার খেলাপ করা কখনোই উচিত হবে না। জানি না আল্লাহ্ এর শেষ কোথায় কিভাবে করবেন।'

তোরমাহ্ বিন আদী হজরত ইমাম হোসেন রা. এর কথা শুনে চুপ করে রইলেন। কোনো উত্তর খুঁজে পেলেন না। কাফেলা যথারীতি সামনের দিকে এগিয়ে চললো।

দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে এক সময় কাফেলা 'কমরে বনী মোকাতেল' এসে পৌঁছালো। হজরত এখানেও যাত্রা বিরতি করলেন না। সামনে আরো অনেক দীর্ঘ পথ পড়ে আছে। আরো কতো দুর্গম, কতো বিপদসংকুল পাহাড়ী উপত্যকা, গিরিখাদ আর ধূষর মরুভূমির দুঃসহনীয় পথ সামনে রয়ে গেছে কে জানে? এখন একটাই ইচ্ছা, এগিয়ে যেতে হবে। এগিয়ে যেতে হবে মনজিলে মকসুদে পৌঁছানোর জন্য। তাতে যতো 'দুঃখ-নিশি' পাড়ি দিতে হোক না কেনো, আর অপেক্ষা নয়। এগিয়ে চলো। সামনে। আরো সামনে।

পথের ক্লান্তি। মানসিক দুশ্চিন্তা। সন্তান ও পরিবার পরিজনদের ভবিষ্যত। খলিফা ইয়াজিদের অন্যায় আদেশ, ওবায়দুল্লাহ বিন যেয়াদের অমার্জনীয় ঔদ্ধত্য– সব কিছু মিলে শরীরে আর মনে আসন গেড়ে বসেছে অবসাদ। নিজেরই অজান্তে এক সময় চোখে নেমে এসেছে ঘুমের আবেশ। তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন হজরত হোসেন রা.। মুহূর্ত মাত্র। তারপরই তিনি অস্ফুট উচ্চারণ করলেন, 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রজিউন। আলহামদুলিল্লাহি রব্বিল আ'লামীন।' পর পর তিনি তিনবার উচ্চারণ করলেন এই আয়াত দু'টি।

আলী আকবর রা. এবং হজরত হোসেন রা. পাশাপাশি চলছিলেন। পিতার এমন উক্তিতে বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'আব্বা আপনি ইন্না লিল্লাহ্ আবার আলহামদুলিল্লাহ্ পড়ছেন, কারণ কি?'

পুত্রের মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদুকণ্ঠে বললেন ইমাম হোসেন, 'বাবা, এইমাত্র আমি স্বপ্নে দেখলাম, একব্যক্তি আমার পাশ দিয়ে যাচ্ছে আর বলছে, লোকগুলো পথ চলছে আর মৃত্যুও তাদের পাশে পাশে চলছে।' আমি বুঝতে পারছি বাবা, আসলে সেই ব্যক্তি আমাদেরকে আমাদের মৃত্যু সংবাদই দিয়ে যাচ্ছে।'

পিতার কথা শুনে থমকে গেলেন আলী আকবর। প্রশ্ন করলেন 'আব্বা, আল্লাহ্ আপনাকে তেমন দুর্দিনের মোকাবেলা না করান। কিন্তু আব্বা, আমরা কি সত্য পথ থেকে দূরে সরে গেছি?'

হজরত হোসেন রা. ছেলের কথা শুনে ধীর কণ্ঠে বললেন,-'না বাবা, আমরা অবশ্যই সত্যের উপরে রয়েছি।'

আলী আকবর পিতার কথায় দৃঢ় কণ্ঠে উত্তর করলেন। 'যদি সত্যের উপরই থাকি। তাহলে আর মৃত্যুতে ভয় কি আব্বা?'

হজরত হোসেন রা. ছেলের এই কথার কোনো জবাব দিলেন না। নীরবেই পথ চলতে লাগলেন।

যোহায়ের হজরতের এই নীরবতাকে সইতে পারলেন না। তিনি তাঁকে অনুরোধ করে বললেন, 'শুধু হোর বাহিনী নয়। এরপরে আরো এক বিরাট বাহিনী আসছে এদেরকে সাহায্য করার জন্য। তখন আমাদের আর কোনো আশাই থাকবে না। বাঁচতে হলে হোর বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করে নিজেদের পথ পরিষ্কার করে নিতে হবে এবং তা এক্ষুণি।'

যোহায়েরের কথা শুনে হজরত হোসেন রা. বললেন, 'না যোহায়ের, তা হয় না। যুদ্ধ আমার দিক থেকে শুরু হোক, এটা আমি চাই না।'

-'তাহলে চলুন, ফোরাতের তীরে ওই যে গ্রাম দেখা যায়, ওখানে গিয়ে আমরা তাঁবু ফেলি।'

-'ওই গাঁয়ের নাম কি?' হজরত হোসেন যোহায়েরকে জিজ্ঞেস করলেন। যোহায়ের বিনীত কন্ঠে বললেন, 'ওই গাঁয়ের নাম 'আকর।'

-'আকর!' থমকালেন হজরত হোসেন। তারপর বললেন, 'আকর' (কাঁটা, বিষাক্ত, ব্যর্থতা) এই গ্রাম থেকে আল্লাহ্র কাছে আশ্রয় চাই।'

পথ চলা বন্ধ হয়নি। এবার একটু বিস্তৃত স্থান জুড়েই হজরতের কাফেলা এগিয়ে যাচ্ছিলো। হোর বাধা দিয়ে বললো,- 'আপনাকে এবং আপনার কাফেলাকে আমি এভাবে এগিয়ে যেতে দিতে পারি না।'

হোরের কথা শুনে বিরক্ত হয়ে তার প্রতিবাদ করলেন হজরত ইমাম হোসেন রা.। হোর তার সিদ্ধান্তে অটল রইলো। এ নিয়ে অনেকক্ষণ পর্যন্ত দু'জনের মধ্যে কথা কাটাকাটি চললেও কোনো সমাধান হলো না।

এ সময় কুফার দিক থেকে একজন অশ্বারোহী এগিয়ে এসে হোরকে সালাম জানিয়ে তার হাতে একটা পত্র দিলো। হজরত হোসেন রা. হোরকে পত্র দিতে দেখে আগ্রহী হয়ে উঠলেন। হোর ইবনে ইয়াযিদ হজরত ইমাম হোসেনের ইচ্ছার কথা জানিয়ে ওবায়দুল্লাহ্ বিন যেয়াদের কাছে যে পত্র পাঠিয়েছিলো সম্ভবত তার উত্তর এসেছে মনে করে তিনি অপেক্ষা করতে লাগলেন। আগন্তুকের দৃষ্টি হজরত হোসেনের উপর পড়তেই সে তার মুখ অন্য দিকে ফিরিয়ে নিলো। এতে তিনি বুঝলেন, প্রাপ্ত নির্দেশ তাঁর অনুকূলে নয়। তিনি একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে চুপ করেই পথ চলতে লাগলেন।

শেষ পর্যন্ত হজরত হোসেন রা.-এর অনুমানই সত্য হলো। হোরকে কুফার গভর্ণর ওবায়দুল্লাহ্ বিন যেয়াদ কঠোর নির্দেশ দিয়েছে, ইমাম হোসেন যেনো কোনো নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে না নিতে পারেন। খোলা প্রান্তর ছাড়া কোথাও যেনো তাঁবু খাঁটানোর সুযোগ না পান। এমনকি আশেপাশে পানি বা খাদ্য সংগ্রহের কোনো ব্যবস্থা যেনো না থাকে। এই নির্দেশ হোর সঠিকভাবে পালন করছে কিনা তা দেখার জন্য এই পত্র বাহক হোরের সাথে সাথেই থাকবে।

হোর ইবনে ইয়াযিদ হজরত হোসেনকে চিঠির মর্ম জানিয়ে দিয়ে বললো, 'এবার আমি নিরুপায়। গাছপালা এবং পানি শূন্য উষর মরুপ্রান্তর ছাড়া আমি আপনাকে পুনর্বার তাঁবু স্থাপনের অনুমতি দিতে পারি না।'

আগন্তুকের ব্যবহারেই তিনি অনুমান করেছিলেন এমন কঠোর নির্দেশই পাঠাবে ওবায়দুল্লাহ্ বিন যেয়াদ। কারণ যার অতীত পাপ পঙ্কিলতায় পূর্ণ, বর্তমান– লোভ, ঘৃণা ও আবিলতায় আকীর্ণ, সে নবী-ফরজন্দ এর প্রতি কোনোদিনই সম্মান প্রদর্শন করতে পারে না।

আল্লাহ্ আর আল্লাহ্র রসুলের প্রতি যাদের শ্রদ্ধা নেই, স্বার্থই যাদের জীবনের মূলমন্ত্র, তারা আপন স্বার্থের গণ্ডী থেকে কখনোই মুক্ত হতে পারে না। খলিফা ইয়াজিদ এবং ওবায়দুল্লাহ্ বিন যেয়াদ তো খোলাফায়ে রাশেদীনের সব নিয়ম নীতি দু'পায়ে দলে নিজেদের হীন স্বার্থকে চরিতার্থ করতে বদ্ধপরিকর। সেখানে কে রসুল স. এর ফরজন্দ, আর কি তাদের প্রাপ্য, তা বিচার করবার সময়ই বা তাদের কোথায়?

কাফেলা এক সময় 'আকর' ছেড়ে আরো একটা বৃক্ষলতা, পানিশূন্য ঊষর প্রান্তরে এসে উপস্থিত হলো। যোহায়ের-এর দিকে হজরত হোসেন রা. প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে চাইতেই যোহায়ের বিনীত কণ্ঠে বললেন, 'এই স্থানের নাম 'কারবালা'।

হজরত অস্ফুট কণ্ঠে বললেন, এটা 'কারব' অর্থাৎ কষ্ট এবং 'বালা' অর্থাৎ মুসিবত। তার মানে কষ্ট এবং মুসিবতের মধ্যেই তাঁর কাফেলা এসে উপস্থিত হয়েছে।

কারবালা। রুক্ষ মরুপ্রান্তর। চারিদিকে শুধু ধু ধু বালুর সমুদ্র। সূর্যের আগুন গলা উত্তাপ ঢেউ খেলছে বাতাসে। কোথাও গাছপালা নেই। নেই সবুজের ছোঁয়া। রুক্ষ ঊষর প্রান্তরে এক ফোঁটা পানিও নেই। আছে শুধু হতাশার অন্ধকার আর দীর্ঘ পথ পাড়ি দেবার অবসাদ।

হজরত হোসেন রা. তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলেন চারিদিক। এখানেই অসহায়ভাবে মৃত্যুবরণ করতে হবে আল্লাহ্ রব্বুল আলামীনের হাবিব হজরত মোহাম্মদ স. এর প্রাণপ্রিয় দৌহিত্রের। যাঁকে দীনের নবী নিজের কলিজার মতো ভালোবাসতেন। যাঁর কান্না তিনি একেবারেই সইতে পারতেন না। যাঁর মুখে হাসি থাকলে দয়াল নবী নিশ্চিন্ত হতেন। মসজিদে নববীতে খুতবা পাঠকালে নবীজি যখন দেখতেন টলমল পায়ে হাসান হোসেন দুই ভাই মসজিদের দিকে এগিয়ে আসছে আর ধুপ করে জমীনে পড়ছে, তখন তিনি খুতবা পাঠ বন্ধ করে মিম্বর থেকে নেমে এসে তাদের বুকে তুলে নিতেন। আদর করে পাশে বসিয়ে আবার খুতবা শুরু করতেন।

সেই প্রাণপ্রিয় দৌহিত্র আজ এসে দাঁড়িয়েছেন কারবালার প্রান্তরে মাবুদের ইচ্ছাকেই হাসিমুখে মেনে নিতে। অন্ধকার পেরিয়ে আলোকের পথে যে যাত্রা শুরু হয়েছিলো, আজ ৬১ হিজরীর ২রা মুহাররম তার শেষ অধ্যায় শুরু হলো যেনো। মাবুদের দরবারে– সেই রব্বুল আলামীনের সান্নিধ্যে মিলিত হবার প্রস্তুতিপর্ব এখন।

একে একে সব আশা তেলশূন্য প্রদীপের মতো জ্বলে জ্বলে নিঃশেষ হয়ে গেলো। হোরের এক হাজার সৈন্যের সাথে ওমর ইবনে সা'আদ এর চার হাজার

সৈন্য এসে যোগ দিলো। চললো রাতের পর রাত আলোচনা বৈঠক। চললো নতুন করে ওবায়দুল্লাহ্ ইবনে যেয়াদের দরবারে চিঠির আদান প্রদান।

কিন্তু কিছুই হলো না। সেই দরবার থেকে আরো নির্মম, আরো কঠোর নির্দেশ এলো শিমার যিল যওশন এর মারফত। ওই এক কথা। নিশ্চিহ্ন করে দিতে হবে। ধ্বংস করে দিতে হবে। বীর কেশরী আলীর ফরজন্দকে শুধু খাঁচায় পুরলেই হবে না। তাঁকে হত্যা করতে হবে। তারপর তাঁর পবিত্র দেহ অশ্বপদতলে পিষ্ট করতে হবে। আর ধড় থেকে মস্তক বিচ্ছিন্ন করে পাঠাতে হবে খলিফা ইয়াজিদের দরবারে। নয়তো রেহাই পাবে না ওমর ইবনে সা'আদ, রেহাই পাবে না তার পরিবার পরিজন।

ওবায়দুল্লাহর নির্দেশ শুনে ভীত শংকিত মেষ শাবকের মত থর থর করে কেঁপে উঠলো ওমরের বুক। আল্লাহ্ রব্বুল আলামীনের প্রতি যাদের আস্থা কমে যায়, রসুলের স. প্রতি যাদের ভালোবাসা শিথিল হয়ে আসে, ইসলামের প্রতি যাদের দরদ অন্তর থেকে উৎসারিত হয় না তাদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার তো হবেই। তাই সত্যের জন্য নয়। শুধুমাত্র নিজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য হঠাৎই যুদ্ধ ঘোষণা করে বসলো ওমর। অসম যুদ্ধ।

ইসলামের জন্য। সত্যের জন্য। ন্যায় আর রসুলের আদর্শকে সমুন্নত করার জন্য এই অসম যুদ্ধকেই হজরত হোসেন রা. নত মস্তকে মেনে নিলেন। জুলফিকার হাতে নিয়ে তিনি তাঁবুর বাইরে এসে দাঁড়ালেন।

অদূরে ইয়াজিদ বাহিনী সার ধরে দাঁড়িয়ে আছে ফোরাত কূল ঘিরে। অশান্ত সমুদ্রের মতো গর্জন তাদের কণ্ঠে। শুধু হুকুমের অপেক্ষা। তাহলেই উত্তাল তরঙ্গের মতো ঝাঁপিয়ে পড়বে তারা ইমাম বাহিনীর উপর। না, বাহিনী ঠিক বলা চলে না, যুদ্ধ প্রস্তুতি নিয়ে কেউ ময়দানে দাঁড়িয়ে নেই। হজরত হোসেন রা. এর সাথে যাঁরা আছেন তাঁরা তাঁরই পরিবারবর্গ-আত্মীয় স্বজন। অবশ্য দু'চার জন অনাত্মীয় হিতৈশী যে নেই তা নয়। এই ছোট কাফেলার অসহায়, ক্ষুধার্ত, পিপাসার্ত মানুষগুলোকে আক্রমণ করে নিশ্চিহ্ন করে দেবে বর্বর শত্রুসেনারা। রক্তের নহর বইবে উত্তপ্ত মরু মৃত্তিকায়। স্বচ্ছসলিলা ফোরাতের বুক বিদায়ী সূর্যের মতো লালে লাল হয়ে উঠবে।

বিচলিত হলেন না হজরত হোসেন রা.। আল্লাহ্র ইচ্ছাইতো সব। তিনি যা করবেন তাই হবে। তাই ধীর পদক্ষেপে নিজের উটের পিঠে উঠে শত্রুসেনাদের আরো কাছে এগিয়ে গেলেন তিনি। তারপর পবিত্র কোরআন শরীফ সামনে ধরে তাদের উদ্দেশ্য করে শান্ত, অচঞ্চল অথচ উচ্চ কণ্ঠে বললেন,-'তোমরা অস্থির হয়ে উঠেছো বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু কেনো? অস্থির হবার কি আছে? আমিতো

তোমাদের সামনেই আছি। যখনই তোমরা ইচ্ছা করবে, তখনই একসাথে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারবে আমার উপর। কিন্তু তোমরা জানো আমি একমাত্র আল্লাহ্ রব্বুল আলামীনের উপরই ভরসা রাখি আর আমি জানি, তিনিই সৎকর্মশীলদের সহায়ক।'

একটু থামলেন হজরত হোসেন রা.। লক্ষ্য করলেন সামনে দাঁড়ানো সৈন্য বাহিনীর প্রতিক্রিয়া। না। কোনো পরিবর্তন নেই তাদের দৃষ্টিতে। ধনুকের ছিলার মত টান টান হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তারা। শুধু ইশারা পেলেই তলোয়ার নিয়ে ইমাম বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে দেরী হবে না একজনেরও।

হজরত ইমাম হোসেন রা. একটু থেমে তাদের মনোভাব বুঝতে চেষ্টা করে পুনরায় বলতে শুরু করলেন, 'আমি কেনো এখানে এসেছি? কারা আমাকে এখানে আসতে বাধ্য করেছে? আর কার নির্দেশেই বা আজ আমাকে চারদিক থেকে ঘিরে রাখা হয়েছে। খাবার নেই, পানি নেই, নেই নিশ্চিত কোনো আশ্রয়। এসবের অভাবে আমাদের পরিবার পরিজন যেনো ক্ষুধায়, তৃষ্ণায় তিলে তিলে শেষ হতে পারে তারই ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু কেনো? কেনো এই অমানুষিক নির্যাতন চালানো হচ্ছে আমার পরিবার পরিজনদের উপর? কেনো নিষ্পাপ শিশু, রুগ্ন কিশোর, অবলা নারীদেরকে মরণের দিকে ঠেলে দেয়া হচ্ছে? বলো এর কি জবাব দেবে তোমরা? কি জবাব দেবে তোমাদের শাসনকর্তারা?'

হজরত হোসেনের কথা শুনে কান্নার রোল উঠলো তাঁবুর ভেতরে। সবাই বুঝে নিয়েছে মরণ ছাড়া মুক্তির আর অন্য কোনো পথ খোলা নেই।

কান্না শুনে বিরক্ত হলেন হজরত ইমাম হোসেন রা.। তিনি ছোট ভাই আব্বাস ও ছেলে আলীকে তাঁবুর ভিতর গিয়ে সবাইকে শান্ত করতে বললেন। বললেন, 'তাদের শান্ত হতে বলো, এ কান্নাই শেষ নয়। বেঁচে থাকলে সারা জীবনই কাঁদতে হবে।'

আব্বাস ও আলী ছুটে গেলেন তাঁবুর ভিতরে।

হজরত হোসেন রা. এবারে আকাশের দিকে তাকিয়ে ব্যাকুলভাবে চিৎকার করে বললেন, 'ইয়া আল্লাহ্, ইবনে আব্বাসকে দীর্ঘ জীবন দিন। তিনি শিশু ও মহিলাদের মক্কায় রেখে আসতে বলেছিলেন। কিন্তু আমি সেকথা শুনিনি।'

তারপর আবার শত্রুসেনাদের লক্ষ্য করে একই সুরে বললেন,-'তোমরা আমার বংশমর্যাদা কি তা জানো? আমিই কি বিশ্বনবী মোহাম্মদ স.-এর দৌহিত্র নই? তাঁর প্রিয় কন্যা, খাতুনে জান্নাত ফাতেমাতুজ জোহরার এবং শেরে খোদা হজরত আলীর প্রাণপ্রিয় সন্তান নই? বদরের যুদ্ধে আত্মদানকারী শ্রেষ্ঠ শহীদ হজরত হামজা রা. কি আমার পিতার চাচা ছিলেন না? তোমরাতো জানো হজরত জাফর তাইয়ার আমারই চাচা ছিলেন। তাছাড়া তোমরা কি ভুলে গেছো আমার আর

আমার ভাই হজরত হাসানের সম্পর্কে রসুলুল্লাহ্ স.-এর সেই অমর বাণী? আমরাই বেহেশতের যুবকদের প্রধান হবো। জেনে রেখো, আমার এই কথা অবশ্যই সত্য। কারণ, আমি জীবনে কখনো মিথ্যা কথা বলিনি।'

একটানা এতগুলো কথা ইয়াজিদের সৈন্যদের উদ্দেশ্যে হজরত ইমাম হোসেন রা. বলে গেলেও কোনো পরিবর্তন এলোনা তাদের মাঝে। যেমন দাঁড়িয়ে ছিলো তেমনি দাঁড়িয়ে রইলো সবাই অস্ত্র হাতে নিয়ে। কখন তাদের সেনাপতি ওমর ইবনে সা'আদ নির্দেশ দেবে শত্রুকে নিশ্চিহ্ন করার, শুধু তারই অপেক্ষা করছে তারা অধীর আগ্রহে।

বিচলিত হলেন না হজরত ইমাম হোসেন রা. নিজেও। কারণ, তিনিতো জানেন, আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন যখন মানুষের মনকে বোধশক্তিহীন করে ফেলেন, তখন তাদেরকে আর সত্য পথে ফিরিয়ে আনা যায় না। সামনে দাঁড়ানো হাজার হাজার সৈন্যদের হৃদয় এখন সত্যপথবিচ্যুত। তাদের হাজারো ভাবে বুঝাতে চাইলেও বুঝবে না। হাজারো ভাবে শুনাতে চাইলেও শুনবে না। ওরা চোখ থাকতে অন্ধ, কান থাকতে বধির আর হৃদয় থাকতেও হৃদয়হীন।

হজরত ইমাম হোসেন রা. ইয়াজিদ বাহিনীকে বুঝানোর জন্য চেষ্টার ত্রুটি করলেন না। কিন্তু তাদের কোনো প্রকার পরিবর্তন না দেখে আবারও তাদের লক্ষ্য করে আরও উচ্চ কণ্ঠে বললেন, 'জাবের ইবনে আবদুল্লাহ আনসারী, আবু সাইদ খুদরী, সোহায়েল ইবনে সা'আদ, সায়েদী, যায়েদ, ইবনে আরকাম, আমাম ইবনে মালেক রা. এই সমস্ত বিশিষ্ট সাহাবীগণ এখনো জীবিত আছেন। প্রয়োজন হলে তোমরা তাঁদের কাছে আমার সম্পর্কে জেনে নিতে পারো। তাঁদেরকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারো, আমার এবং আমার ভাই-এর সম্পর্কে আমি যে কথা বলেছি তা রসুলে মকবুল স. এর মুখে তাঁরা শুনেছেন কিনা? যদি শুনে থাকেন এবং তাদের কথাকে যদি তোমরা বিশ্বাস করে থাকো, তাহলে কেনো তোমরা আমাকে আজ হত্যা করতে চাও?

আল্লাহ্র কসম, আমি ছাড়া এই পৃথিবীতে নবী মোহাম্মদ স. এর প্রিয় কন্যা খাতুনে জান্নাত হজরত ফাতেমাতুজজোহরার রা. এর আর কোনো পুত্র সন্তান জীবিত নেই। তাছাড়া আমিতো কখনো কাউকে হত্যা করিনি। কারোও রক্তপাত ঘটাইনি? এমনকি কারো কোনো সম্পদও ছিনিয়ে নেইনি? তবে কেনো তোমরা এই হীন নীচ কাজে এগিয়ে এসেছো? কেনো তোমরা আমাকে হত্যা করতে চাও? বলো, উত্তর দাও?'

কে দেবে এই প্রশ্নের উত্তর? ওদের তো নিজের মতামত দেবার কোনো অধিকারই নেই। ওরাতো নিজেদের বিবেক বিক্রি করে দিয়েছে ইয়াজিদের নিযুক্ত কুফার শাসনকর্তা ওবায়দুল্লাহ্ বিন যেয়াদের পায়ের তলে।

তাই সবাই নিশ্চুপ। নিথর। নিস্পন্দ। হজরত হোসেন রা. কোনো উত্তর না পেয়ে এবারে কুফার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নাম ধরে ডাকতে শুরু করলেন,-

-'হে রাবঈ'র পুত্র আশআছ, জবরের পুত্র হেজাব, আশআছের পুত্র কায়েস, হারেসের পুত্র ইয়াজিদ, তোমরা কেনো চুপ করে আছো? তোমরা কি আমাকে চিঠির পর চিঠি দিয়ে এখানে আসতে বলোনি? তোমরা কি লেখোনি যে, ফুল ফুটেছে, ফল পেকেছে। নদীতে জোয়ার এসেছে। এখুনি আপনার আগমনের উপযুক্ত সময়। যদি আসেন তাহলে নিজের বীর সৈনিকদের কাছেই আসবেন?

-'না, আমরা বলিনি। আমরা আপনাকে কখনোই আসতে চিঠি লিখিনি' একযোগে ইয়াজিদ সৈন্যরা প্রতিবাদ করে উঠলো।

-'মিথ্যে কথা। নিশ্চয় তোমরা লিখেছো?' ঘৃণায় ফেটে পড়তে চাইলেন হজরত ইমাম হোসেন রা.। তিনি অবাক হয়ে গেলেন তাদের মুখ থেকে অবলীলায় মিথ্যা কথা উচ্চারিত হতে দেখে।

-'আল্লাহ্‌র কসম। তোমরাই লিখেছো।'

-'না-না-না।' সমস্বরে প্রতিউত্তর ভেসে এলো শত্রু পক্ষ থেকে আবারও,- 'আমরা নই, আমরা নই, আমরা নই।'

হতবাক হয়ে গেলেন তিনি। এও কি সম্ভব? মানুষ কি জ্বলন্ত সত্যকে অস্বীকার করতে পারে? পারে কি আল্লাহ্ রব্বুল আলামীনের নির্দেশকে অস্বীকার করতে? পারে কি রসুলে মকবুল স. এর উপদেশকে উপেক্ষা করতে?

পারে। মানুষ সবই পারে। হজরত ইমাম হোসেন রা. বুঝলেন, দ্বীনের নবীর আদর্শ যখন মানুষের হৃদয় থেকে দূরে সরে যায়, তখন আর সত্য মিথ্যার মধ্যে কোনো প্রভেদ থাকে না। ন্যায়নীতিকে বিসর্জন দিতে তখন আর কেউ কুণ্ঠাবোধ করে না।

এরা আদর্শচ্যুত। এরা ওয়াদা খেলাপকারী। এরা এখন সব পারে। তাই তিনি চিৎকার করে তাদের উদ্দেশ্যে বললেন। 'আমি বুঝতে পারছি, এখন আর তোমরা আমাকে চাও না। ঠিক আছে, তোমাদের কাছে যখন আমার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে, তখন শুধু শুধু আমার পথ আটকে রেখেছো কেনো, পথ ছেড়ে দাও। আমি ফিরে যাই।'

–'ফিরে যাবেন কেনো? আমিরুল মুমেনীন ইয়াজিদের কাছে আত্মসমর্পণ করুন। আমি বিশ্বাস করি আপনার প্রতি তিনি এমন কোনো ব্যবহারই করবেন না, যা আপনার অপছন্দ হতে পারে।'

কায়েস ইবনুল আসআশের কথা শুনে হজরত হোসেন রা. পরিষ্কার বুঝতে পারলেন, তারা আর তাঁকে ফিরতে দেবে না। তিনি প্রতি উত্তরে বললেন,- 'আসআশ, তুমি কি চাও যে, বনী হাসেম গোত্র মুসলিম ইবনে আকীল ছাড়া আরো একটি খুনের দাবীদার হোক? না, তা কখনোই হতে পারে না। মান সম্মান, ন্যায়নীতিকে বিসর্জন দিয়ে আমি আত্মসমর্পণ করতে পারি না।'

যোহায়ের এতক্ষণ অদূরে দাঁড়িয়ে ইমাম হোসেন রা. এর কথা শুনছিলেন, এবার তিনি তাঁর ঘোড়া ছুটিয়ে সৈন্যদলের সামনে এগিয়ে এসে চিৎকার করে বললেন, 'হে কুফাবাসী, তোমরা কি আল্লাহ্‌র শাস্তির কথা ভুলে গেছো। নইলে সত্যকে এভাবে উপেক্ষা করছো কেনো? তোমারা মুসলমান। এক আল্লাহ্‌র ও রসুলের আদর্শে বিশ্বাসী। আমরা ধর্ম, ন্যায় ও সত্যের পথে সবাই সবার ভাই। ভাই হয়ে ভাইয়ের মঙ্গলের জন্য সদুপদেশ দেয়া কর্তব্য। আমি সেই কর্তব্য পালনের জন্য এগিয়ে এসেছি। আমার কথা তোমরা শোনো।

দেখো, আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন আমাদেরকে কঠিন পরীক্ষায় ফেলেছেন। কোনটা সঠিক এবং কোনটা সঠিক নয়, তা বেছে নেবার এই মহাপরীক্ষায় আমাদের জয়লাভ করতেই হবে।

এসো। আমরা আহলে বাইয়েতকে সমর্থন করি। ন্যায়কে প্রতিষ্ঠা করি। আর পরিত্যাগ করি অহংকারী ওবায়দুল্লাহ্ ইবনে যিয়াদকে যার দ্বারা আমাদের কোনোই উপকার হবে না। হতে পারে না। কারণ, সে এবং তার মনিব দু'জনেই নিজ নিজ স্বার্থকে বড় করে দেখতে শুরু করেছে।

তোমরা কি তার প্রমাণ পাওনি। তোমরা কি দেখোনি, তারা ধর্মপরায়ণ মানুষকে ধরে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছে। তোমরা কি দেখোনি হাজর ইবনে আদী, ইবনে আমরের মতো মানুষকে তাদের হাতে প্রাণ দিতে হয়েছে।

আজ তারা তোমাদের লোভ দেখিয়ে রসুলের ফরজন্দের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়েছে। কাল তোমাদেরই চক্ষু অন্ধ করে দেবে। হাত পা বেঁধে গাছে ঝুলিয়ে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করবে। কারণ, তারা শুধু নিজেদের স্বার্থকেই বড় করে দেখতে শিখেছে। আর কারো নয়। তারপর যখন স্বার্থ উদ্ধার হয়ে যাবে, তখন আর তোমাদের কোনো মূল্যই তাদের কাছে থাকবে না। পরিত্যক্ত সামগ্রীর মতো দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেবে তোমাদেরকে।'

কুফার সৈন্যরা যোহায়েরের আবেগাপ্লুত বক্তৃতা শুনে একটুও বিচলিত হলো না। তারা ওবায়দুল্লাহ বিন যেয়াদের সমালোচনা করায় গালাগাল শুরু করে দিলো; 'যোহায়ের, তুমি ভালো করে শুনে রাখো, আমরা হোসেন এবং তার সাথীদেরকে হয় আমীরুল মুমেনীন ইয়াজিদের কাছে হাজির করবো, নয়তো তাদের হত্যা করবো। তাছাড়া এখান থেকে আমরা কখনোই ফিরতে পারি না।'

-'হে পাষাণের দল, সুমিয়ার ছেলে ইবনে যেয়াদের চাইতে নবীনন্দিনী খাতুনে জান্নাত হজরত ফাতেমার সন্তান কি বড় নন, সম্মানীয় নন? ক্ষোভে দুঃখে ভেঙে পড়তে চাইলেন যোহায়ের। তবুও তিনি নিজেকে শান্ত রাখতে চেষ্টা করে পুনরায় বললেন,-'আওলাদে রসুল স. যদি তোমাদের সাহায্য সহানুভূতি নাও পান, তবু মানুষ হিসাবে কি তোমাদের কোনো কর্তব্য নেই। তাঁকে এবং ইয়াজিদকে নিজেদের ব্যাপারে সবকিছু মীমাংসা করে নেবার সুযোগ করে দেয়া উচিত নয়? ইয়াজিদকে সন্তুষ্ট করার জন্য ইমাম হোসেনের রক্তপাত ঘটাতে হবে কেনো। অন্যভাবেও তো সন্তুষ্ট করতে পারো তোমাদের খলিফাকে।'

যোহায়েরের আবেদন, হজরত হোসেনের প্রাণস্পর্শী ভাষণ কোনো রেখাপাতই করলো না শত্রু সৈন্যদের মনে।

হোর ইবনে ইয়াজিদ কিন্তু এতোটা আশা করেনি। কাদেসিয়ার পরে সে যখন হোসেন রা.কে বাধাদান করার জন্য এক হাজার সৈন্য নিয়ে এগিয়ে এসেছিলো তখনোই সে মনের মধ্যে একটা বিশ্বাস লালন করে আসছিলো, যে করেই হোক, ওবায়দুল্লাহ বিন যেয়াদের সাথে হজরত হোসেনের একটা মীমাংসা হয়তো হয়েই যাবে। তার বিশ্বাস ছিলো, ওবায়দুল্লাহ্ বিন যেয়াদ যেই নির্দেশই দিক না কেনো, হত্যার নির্দেশ দেবে না। সম্মানীয় ব্যক্তির অবমাননা করবে না। তাই সে যেয়াদের আদেশ পালন করলেও হজরতের সাথে কখনোই দুর্ব্যবহার করেনি। এমনকি তাঁকে ইমাম হিসাবে স্বীকার করে নিয়ে তাঁর পেছনে সেনাবাহিনীসহ নামাজ পড়তেও দ্বিধা করেনি।

কিন্তু এতো কিছুর পরেও হোর ইবনে ইয়াজিদ ইমাম হোসেনকে কারবালায় আসতে বাধ্য করেছে। কারণ তার বিশ্বাস ছিলো, আলোচানার মাধ্যমে সবকিছুরই সমাধান করা যাবে। তাই কারবালায় এসেও সে ওবায়দুল্লাহর নির্দেশের অপেক্ষায় ছিলো।

নির্দেশ এলো। কিন্তু তা আলোচানার জন্য নয়। নিষ্ঠুরভাবে ইমাম রা.কে হত্যা করে তার মস্তক ইয়াজিদের দরবারে পাঠানোর জন্য। এব্যাপারে কোনো প্রকার গাফলতি যেনো না হয়, তারই নির্দেশনামা নিয়ে শিমারকে পাঠানো হয়েছে ওমর ইবনে সা'আদের কাছে।

হোর বুঝেছে তার এতোদিনের বিশ্বাস ধূলায় লুণ্ঠিত হয়েছে।

আহা! কি ভুলইনা করেছে সে। অন্তর তার এই ভুলের অনুশোচনায় পুড়ে যেতে লাগলো। কি করতে পারে সে এখন। কি করলে তার ভুলের প্রায়চিত্ত হতে পারে। সে জানে এখন আর কোনো সুযোগ নেই, সুযোগ নেই নতুন করে সৈন্য সংগঠিত করে ওবায়দুল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার। সুযোগ নেই হজরত ইমাম হোসেনকে রক্ষা করার জন্যে অন্য কোনো পথ বের করার। এখন যুদ্ধ। অসম যুদ্ধ। একদিকে পাঁচ হাজার সুসজ্জিত সৈন্য। অন্যদিকে জরাজীর্ণ নারী পুরুষ, কিশোর যুবা বৃদ্ধা মিলে মাত্র আশিজন। মৃত্যু ছাড়া সামনে আর কিছুই নেই তাদের।

হোর ওমর ইবনে সা'আদকে সৈন্য পরিচালনা করতে দেখে ইতস্তত করে বললো, 'হে সেনাপতি ওমর ইবনে সা'আদ, আল্লাহ্ আপনার মঙ্গল করুন। আপনি কি সত্যিই ইমাম হোসেনের সাথে যুদ্ধ করবেন?'

-'অবশ্যই'-ওমর উত্তর করলো, 'যুদ্ধ। নিশ্চিত যুদ্ধ। এমন যুদ্ধ যে, এতে মস্তক শরীরচ্যুত হবে, হাত শরীর থেকে আলাদা হয়ে যাবে।'

-'কিন্তু কেনো? হোর অসহিষ্ণু হয়ে প্রশ্ন করলো আবার,-'ইমাম হোসেন রা যে তিনটি শর্ত দিয়েছিলেন তার একটিও কি মেনে নেয়া সম্ভব হলো না?'

ওমর থমকে গেলো হোরের কথা শুনে। স্থিরভাবে তার দিকে তাকিয়ে আবেগভরা কণ্ঠে উত্তর করলো,-'আল্লাহ্র কসম দিয়ে বলছি, তুমি বিশ্বাস করো, আমার যদি ক্ষমতা থাকতো তাহলে তাঁর শর্ত আমি মেনে নিতাম। কিন্তু কি করবো?' তোমাদের শাসনকর্তা এর কোনোটাই মেনে নিতে রাজি হলো না।'

'হ্যাঁ, আমাদেরই তো শাসন কর্তা। আমরাইতো তাকে সমর্থন দিয়েছি। আমরাইতো তাকে সাহায্য করেছি। কুফাবাসীরা একযোগে অস্ত্র হাতে এই কারবালা ময়দানে ছুটে এসেছি।' মনে মনে নিজেকেই নিজে বার বার ধিক্কার দিতে লাগলো হোর।

কি করা যায়? এবারে কি করা উচিত? তার সমস্ত পথতো সেই প্রথম বন্ধ করে দিয়েছে। কাদেসীয়ার পরে ইমাম হোসেন রা.কে সেইতো বেষ্টন করে মৃত্যুর দিকে ঠেলে নিয়ে এসেছে। তিনি তো ফিরে যেতে চেয়েছিলেন। চলে যেতে চেয়েছিলেন মদীনার পথে তাঁর পরিবার পরিজনদের নিয়ে।

অস্থির হয়ে উঠলো হোর। একটা কিছু তাকে করতেই হবে। হ্যাঁ, অবশ্যই করতে হবে। এক্ষুণি। এই মুহূর্তে। ভাবনার সাথে সাথে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললো, যুদ্ধ করবে। সে যুদ্ধ করে প্রাণ দেবে। তবে ওমর ইবনে সা'আদ এর নেতৃত্বে নয়। হজরত হোসেন রা এর পক্ষে যুদ্ধ করবে। হাসিমুখে প্রাণ দেবে। শেষ মুহূর্তে হলেও রব্বুল আলামীনের দরবারে মাথা নিচু করে দাঁড়াতে পারবে সে। বলতে পারবে, 'হে আল্লাহ্ আমাকে অনন্ত কাল ধরে ওই জাহান্নামের আগুনে পুড়তে

দাও, তবুও মনে করবো আমি সত্য পথে ফিরে আসতে পেরেছি। ফিরে আসতে পেরেছি তোমার প্রিয় দোস্ত স. এর দৌহিত্রের পায়ের কাছে।'

হোর পায়ে পায়ে তার দলের কাছে ফিরে এলো। পাশেই ঘোড়ায় জীন এঁটে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলো কোররাহ্ ইবনে কায়েস। হোর তাকে জিজ্ঞেস করলো, 'কোররাহ্ তুমি কি তোমার ঘোড়াকে পানি খাইয়েছো?'

-'না, খাওয়াইনি এখনো?'

-'তাহলে তাকে পানি খাইয়ে আনো।'

কোররাহ্ হোরের এমন আচরণে বেশ অবাক হয়ে গেলো। সে বিস্মিত দৃষ্টিতে তার আপাদমস্তক লক্ষ্য করলো। তারপর মৃদু কণ্ঠে বললো,-'ঠিক আছে আমি যাচ্ছি।' কোররাহ্ তার ঘোড়া নিয়ে সেখান থেকে সরে গেলো।

হোর এটাই আশা করছিলো। তাঁকে যেনো কেউ বাধা দেবার সুযোগ না পায়, তাই এই কৌশলের আশ্রয় নেয়া। কোররাহ্ সরে যেতেই হোর ইমাম হোসেনের শিবিরের দিকে তার ঘোড়া ছুটিয়ে দিলো।

পাশে পাশেই ঘোড়া ছুটিয়ে এলো তারই দলের আর একজন সৈন্য মোহাজের ইবনে আওস। সে হোরের মনোভাব বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি কি ইমাম হোসেনকে আক্রমণ করবে?

হোর নিরুত্তর রইলো। মোহাজের হোরের নীরবতায় পরিষ্কার বুঝতে পারলো সে কি করতে চায়। তবুও পুনরায় জিজ্ঞেস করলো, 'কি ব্যাপার, চুপ করে আছো কেনো? তোমাকে তো কোনো যুদ্ধক্ষেত্রেই এমন বিচলিত হতে দেখিনি? তুমি জানো, যদি কেউ আমাকে প্রশ্ন করে, কুফার সর্বশ্রেষ্ঠ বীর পুরুষ কে? তাহলে তোমার নামই আমার মুখ থেকে উচ্চারিত হবে। কারণ সত্যিই তুমি তাই। কিন্তু এখন তোমার ব্যবহার আমাকে চিন্তিত করে ফেলেছে। আসলে তুমি কি চাও, চুপকরে না থেকে পরিষ্কার করে বলো?'

মোহাজেরের কথা শুনে হোর শান্ত, ধীর অথচ প্রত্যয়দীপ্ত কণ্ঠে উত্তর করলো, 'মোহাজের, তুমি ঠিকই বলেছো, আমি একটা কিছু সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে চেষ্টা করছিলাম।'

-'কি সিদ্ধান্ত? কিসের সিদ্ধান্ত?'

-' বেহেশত এবং দোজখের। কোনটা নেবো আর কোনটা নেবো না সেই চিন্তাই করছিলাম।'

-'কি বলছো তুমি।' বিস্মিত মোহাজের।

-'হ্যা,' দৃঢ় প্রত্যয়ী কণ্ঠ হোর ইবনে ইয়াযিদের। 'আল্লার কসম। এ দু'টোর মধ্যে বেহেশতই বেছে নিলাম। এখন আমাকে যদি অস্ত্রঘাতে ছিন্ন বিছিন্ন করে ফেলা হয়, তবুও আমার আর দুঃখ থাকবে না।'

হোর কথা শেষ করে আর এক মুহূর্ত সেখানে অপেক্ষা করলো না। ঘোড়া ছুটিয়ে ইমাম হোসেনের বাহিনীর পাশে এসে দাঁড়ালো।

হজরত হোসেন রা. অবাক বিস্ময়ে হোরকে লক্ষ্য করছিলেন। তিনি কিছু বলার আগেই হোর বেদনাহত কণ্ঠে বললো,' হে রসুল স. এর ফরজন্দ, আমি সেই অমানুষ যে আপনাকে পরিবার পরিজনদের নিয়ে মদীনায় ফিরে যেতে দেয়নি। আশ্রয় নিতে দেয়নি কোনো শ্যামল প্রান্তরে। তাঁবু খাটাতে দেয়নি কোনো জলাশয়ের পাশে। আমি সেই নরাধম, যে আপনাকে এই ধূসর পানিবিহীন প্রান্তরে তাঁবু খাটাতে বাধ্য করেছে। কিন্তু বিশ্বাস করুন, আল্লাহ্‌র কসম, আমি ভাবতেও পারিনি, আপনার শর্ত গুলোর একটিও মেনে নেয়া হবে না।

আমি ধারণা করেছিলাম, আর যাই ঘটুক কুফার শাসনকর্তা আপনাকে অন্ততঃ হত্যা করার মতো জঘন্য কাজের আদেশ দেবে না। কিন্তু এখন দেখছি, আমার সব ধারণাই মিথ্যে হয়ে গেলো। আহ্! আগে যদি একটুও বুঝতে পারতাম, তাহলে এই বিপদসংকুল পথে আপনাকে টেনে আনতাম না। কখনোই না।

হে রসুলের স. ফরজন্দ, আমার অপরাধের সীমা পরিসীমা নেই। আমি জানি এই অপরাধের কোনো ক্ষমাও নেই। তবুও এসেছি, আপনি আমাকে আমার অপরাধের জন্য অন্ততঃ অনুশোচনা করার সুযোগ দিন। আমি আর ইয়াযিদের সৈন্যদলে ফিরে যেতে চাই না। আপনার পায়ের কাছে থেকে এই সত্য পথের সংগ্রামে শরীক হয়ে শাহাদাতবরণ করতে চাই। জানি না, এতেও আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে কিনা। মাবুদ আমাকে মাফ করবেন কিনা।'

হজরত ইমাম হোসেন রা. তাঁকে কাছে টেনে নিলেন। সন্তানকে পিতা যেমন স্নেহবন্ধনে আবদ্ধ করে হাসিমুখে উপদেশ দেন, ঠিক তেমনি স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে বললেন, 'আল্লাহ্ তোমার গুনাহ্ মাফ করে দেবেন। তোমার নাম কি?

-'হোর। ইয়াজিদের পুত্র হোর। হোর ইবনে ইয়াজিদ।'

হজরত হোসেন রা. মৃদু হেসে বললেন, 'তুমি হোর-ই বটে। হোর অর্থ মুক্ত। তোমার মা যেমন তোমার নাম রেখেছেন, তেমনি আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন দুনিয়া ও আখেরাতে তোমার নাম সার্থক করবেন।'

হজরতের মমতামাখানো কথা শুনে হোরের চোখ ফেটে নোনাপানি গড়িয়ে পড়লো। আহা, এমন আকাশের মতো উদার যার হৃদয়, তার প্রতি কতো অবিচারই না সে করেছে। কতো কষ্টই না দিয়েছে। জীবন দিয়েও বুঝি এই ভুলের মাশুল শোধ করা যাবে না।

তার মনে হলো, চেষ্টা করতে হবে। শেষ চেষ্টা। যদি এই অসম যুদ্ধকে ঠেকানো যায়, তাহলে হয়তো সব চাইতে বড় অপরাধের, সবচাইতে বড় অন্যায়ের কিছুটা হলেও প্রায়শ্চিত্ত করা যাবে। তাই হোর মুহূর্ত বিলম্ব না করে শত্রু সৈন্যদের সামনে এগিয়ে গিয়ে উচ্চস্বরে বলতে লাগলো, 'হজরত হোসেন রা. তোমাদের সেনাপতির মারফত তিনটি শর্ত কুফার শাসনকর্তার কাছে পেশ করেছিলেন। সেই তিনটি শর্তই ছিলো ন্যায়সঙ্গত। অথচ তা সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করা হয়েছে। আমি তোমাদের কাছে আবেদন করছি, ওই তিনটি শর্তের যে কোনো একটি তোমরা মেনে নাও। এতে শুধু তোমাদের মঙ্গল হবে তাই নয়, আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন তোমাদের এই মহাপরীক্ষার হাত থেকেও রক্ষা করবেন।'

সৈন্যবাহিনীর মধ্য থেকে কয়েকজন উত্তর করলো, 'তুমি যা বলছো সে ব্যাপারে আমাদের কিছুই বলার নেই। এ সম্পর্কে আমাদের সেনাপতি যা বলবেন, তাই আমরা মেনে নেবো।'

ওমর ইবনে সা'আদ এবার বেদনাহত কণ্ঠে উত্তর করলো,-'হে হোর ইবনে ইয়াজিদ, তুমি যা বলেছো তাতে আমার কোনোই অমত ছিলো না। আমিও আশা করেছিলাম ওই তিনটি ন্যায়সংগত শর্তের যে কোনো একটি মঞ্জুর হোক। কিন্তু তা হয়নি। এখন এই সৈন্যদলের প্রধান সেনাপতি হিসাবে আমাকে আমার শাসনকর্তার হুকুমই মেনে চলতে হবে।'

-'না, তা হতে পারে না। চিৎকার করে প্রতিবাদ জানালো হোর। বললো, 'দেশের শাসনকর্তা যদি শুধুমাত্র তাদের স্বার্থের জন্য অন্যায় আদেশ করে থাকে, তাহলে তাকে সমর্থন করার মধ্যে কোনো বাহাদুরী নেই। এখনও সময় আছে, তুমি সঠিক পথ বেছে নাও।'

ওমর ইবনে সা'আদ হোরের এই কথার কোনো জবাব দিলো না। সে তার তীর ইমাম হোসেন রা. এর সৈন্য বাহিনীকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মেরে চিৎকার করে বললো, 'তোমরা সবাই সাক্ষী থেকো, আমিই প্রথম তীর নিক্ষেপ করে যুদ্ধের সূচনা করলাম।'

তীর ছুটে এলো ইমাম হোসেন রা. এর সৈন্য বাহিনীর দিকে। যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলো। কোনো অনুরোধ, উপরোধ, উপদেশ, আদেশ, বক্তৃতা-বিবৃতি কাজে লাগলো না। সত্যের প্রতি অসত্যের আক্রমণ, ন্যায়ের প্রতি অন্যায়ের আঘাত আসতে শুরু করলো অবিরাম অবিশ্রান্তভাবে।

ইবনে সা'আদ এর তীর ছুটে আসতেই অন্যান্য সৈন্যরাও তীর ছোঁড়া শুরু করে দিলো। ইমাম পক্ষও আর চুপ করে রইলেন না। তাঁদের তীরও সা'আদের সৈন্যের দিকে উড়ে চললো।

হজরত হোসেন প্রথমে আক্রমণ করবেন না প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। তিনি চরম বিপদেও আল্লাহ্‌র প্রতি অনুগত রইলেন। কিন্তু এবার শত্রু পক্ষের আক্রমণ প্রতিহত করতে তাঁর সৈন্যদেরকেও নির্দেশ দিলেন তিনি। তীর নিক্ষেপের কিছুক্ষণ পরই সম্মুখ যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলো।

প্রাচীন রীতি ছিলো উভয় পক্ষের সৈন্য সারি ধরে দু'দিকে দাঁড়িয়ে থাকবে আর তাদের মধ্য থেকে এক এক জন ময়দানে নেমে এসে অন্য পক্ষকে আহ্বান করবে এবং তীর, বর্শা, বল্লম ও তরবারী দ্বারা আক্রমণ চালাবে। আত্মরক্ষা, প্রতিআক্রমণ এবং জয় অথবা পরাজয়। নিহত ব্যক্তির পক্ষে ছুটে আসবে আর একজন। যুদ্ধ চলবে এভাবেই তারপর এই আক্রমণ ও প্রতিআক্রমণ ধীরে ধীরে ব্যাপকতা নেবে। ছড়িয়ে পড়বে দু'পক্ষের মাঝেই। এক থেকে দু'জন তারপর দশ পঞ্চাশ এবং শেষে সমস্ত বাহিনী।

এ নিয়ম অনুসারেই ওমর ইবনে সা'আদের বাহিনীর যেয়াদ ইবনে আবীহ, ওবায়দুল্লাহ ইবনে যেয়াদের ভৃত্য ইয়াসার এবং সালেম ময়দানে ছুটে এসে ইমাম বাহিনীর প্রতি লক্ষ্য করে চিৎকার করে বললো,-'কে আছো, যারা আমার সাথে যুদ্ধ করতে চাও? এগিয়ে এসো।' ওদের ঔদ্ধত্যপূর্ণ আস্ফালন ইমাম বাহিনীর সৈন্যদের বুকে আগুন ধরিয়ে দিলো। হাবীব ইবনে মোযাহের এবং বারীর ইবনে হাযবীর হজরত হোসেন রা. এর অনুমতি চাইলেন। বললেন, 'হজরত আমাদের অনুমতি দিন। ওদের যুদ্ধের সাধ আমরা জীবনের মতো মিটিয়ে দিয়ে আসি।'

হজরত হোসেন রা. তাঁদের অনুমতি দিলেন না। কিন্তু এ সময় আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমায়ের কালবী তাঁর সামনে এগিয়ে এসে বিনীত প্রার্থনা জানালো,-'ইয়া হজরত, এই দাসকে অনুমতি দিন।'

আত্মপ্রত্যয়ে দীপ্ত কণ্ঠস্বর শুনে হজরত হোসেন রা. মুখ তুলে তাকালেন। দেখলেন কালো পাথরে খোদাই করা শিল্পীর হাতের এক অপূর্ব ভাস্কর যেনো। যেমনি চওড়া বুক, তেমনি উজ্জ্বল দু'টি চোখ। আর সেই চোখে আত্মত্যাগের এক অনাবিল আকুলতা। হজরত মৃদু হেসে সম্মতি দিয়ে বললেন, 'ময়দানের উপযুক্তই বটে।'

আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমায়ের কালবী হজরতের হুকুম পেয়ে তরবারী হাতে যুদ্ধক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। অহংকারী ইয়াসার ও সালাম তাঁর সামনে মুহূর্তের জন্যও দাঁড়াতে পারলো না। তীক্ষ্ণ তরবারীর আঘাতে জমিনে লুটিয়ে পড়লো তারা। সম্মুখযুদ্ধে স্বামীর সাফল্যে আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়লেন কালবীর সহধর্মিণী। তিনি কুফা থেকে স্বামীর সাথেই হজরত হোসেন রা. এর সাহায্যের জন্যে এগিয়ে এসেছেন শত বাধা উপেক্ষা করে। আজ স্বামীর বীরত্ব তাকে এতো বেশী উদ্বেলিত করে তুলেছে যে, স্থান কাল ভুলে তিনিও লাঠি হাতে ময়দানে নেমে স্বামীকে উৎসাহিত করতে লাগলেন। ইমাম বংশের প্রতি স্বামীর এই অফুরন্ত ভালোবাসা, সত্যের প্রতি নিষ্ঠা তাঁকে সব নিয়মনীতির বাইরে নিয়ে এসেছে। তিনি ভুলে গেছেন যুদ্ধক্ষেত্রে নারীর আবির্ভাব স্বাভাবিক নয়। হজরত হোসেন রা. মহিলার এই অন্তরনিঃসৃত ভালোবাসা লক্ষ্য করে অভিভূত হয়ে পড়লেন। বললেন, 'আহলে বাইয়েতের পক্ষ থেকে আল্লাহ্ তোমাকে উত্তম পুরস্কার দান করুন। কিন্তু জেনো, মহিলাদের জন্য রণাঙ্গণ নয়।'

ইমামের কথা শুনে কালবীর স্ত্রী পেছনে সরে এলেন। ওমর ইবনে সা'আদ দেখলো এভাবে যুদ্ধ করলে ইমাম সৈন্যদের সাথে কোনোভাবেই টিকে থাকা যাবে না। তার ইঙ্গিতে এবার তার ডান দিকের সৈন্যবাহিনী একযোগে আক্রমণ শুরু করলো।

ইমাম বাহিনীও বিন্দুমাত্র অপেক্ষা না করে শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করতে বীর বিক্রমে পাল্টা আঘাত হানতে লাগলো।

যুদ্ধ ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। শত্রু সৈন্য যখনই সামনে এগিয়ে আসতে চেষ্টা করে, সে আর ফিরে যেতে পারে না বর্শার আঘাতে নয়তো তরবারীর নীচে অসহায়ের মতো প্রাণ দিতে হয়। অবস্থা বেগতিক দেখে শত্রুপক্ষের ডান দিকের সৈন্যবাহিনীর সেনাপতি আমর ইবনে হাজ্জাজ চিৎকার করে তার সৈন্যদের বললো, 'ওরে হতভাগার দল, তোমরা কার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছো তা কি বুঝতে পারছো না? যাঁরা জীবনকে কখনোই বড় মনে করেনি। মর্যাদার লড়াইতে যারা হাসিমুখে প্রাণ দিতে পারে, তাদের সাথে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে বিজয়লাভ করা যাবে না। একযোগে আঘাত হানো। পাথর ছুঁড়ে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন

করো। চারদিক থেকে ঘিরে তাদের ধ্বংস করে দাও। নয়তো তোমাদেরকেই নিশ্চিহ্ন হতে হবে।'

ওমর ইবনে সা'আদও হাজ্জাজের বক্তব্যকে সমর্থন করলো। সেনাপতির আদেশ পেয়ে হিংস্র হায়নার মতো একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়লো ইমাম বাহিনীর উপর। তলোয়ারে-তলোয়ারে আগুন ছুটলো। বর্শার আঘাতে আঘাতে বুকের টকটকে লাল রক্ত ছুটলো নদীর মতো। ঘোড়ার খুরের আঘাতে কারবালার ময়দানে উঠলো ধূলোর ঝড়। আহত মানুষের চিৎকার, বিজয়ী সৈন্যের উল্লাস আর তাঁবুর ভেতরে তৃষ্ণার্থ মানুষের হাহাকার মিলে যুদ্ধক্ষেত্র মুহূর্তের মধ্যে হয়ে উঠলো হাবিয়া দোজখের মতো ভয়ঙ্কর।

একটানা যুদ্ধ চললো বেশ কিছুক্ষণ। তারপর যুদ্ধের তীব্রতা কিছু কমে আসতেই দেখা গেলো ইমাম পক্ষের বীর যোদ্ধা মুসলিম ইবনে আউসাজা মারাত্মকভাবে আহত হয়ে ময়দানে পড়ে ছটফট করছেন। শত্রু বাহিনীর অনেক লাশ তার আশে পাশে ছড়িয়ে আছে।

আহত আউসাজার চিৎকার শুনে হজরত হোসেন রা. তার পাশে ছুটে গেলেন। বেদনায় নীল হয়ে গেলো তাঁর পবিত্র মুখমণ্ডল। দুঃখভারাক্রান্ত কণ্ঠে তিনি বললেন, 'মুসলিম, তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র রহমত বর্ষিত হোক।' তারপর মৃদুকণ্ঠে উচ্চারণ করলেন 'তোমাদের কিছু সংখ্যক মৃত্যুবরণ করেছে এবং কিছু মৃত্যুর অপেক্ষায় আছে, তবুও তাদের কেউ সত্য পথ থেকে দূরে সরে যায়নি।

মুসলিম ইবনে আউসাজা ধীরে ধীরে চোখ বন্ধ করলেন। তাঁর পবিত্র আত্মা আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য লাভের উদ্দেশ্যে অনন্ত পথে পাড়ি জমালো। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রজিউন। ইমাম পক্ষের প্রথম শহীদ মুসলিম ইবনে আউসাজাকে দেখে মুহূর্তের জন্য থমকে গেলো সবাই। কিন্তু তারপরই আবার বিপুল বিক্রমে শত্রুর উপরে ঝাঁপিয়ে পড়লো। তরবারীর আঘাতে ছিন্ন ভিন্ন করে দিতে লাগলো ইয়াজিদ বাহিনীর দুর্ভেদ্য বেষ্টনী।

ইমাম বাহিনীর সম্মিলিত আক্রমণে বিপর্যস্ত ইয়াজিদ বাহিনী বুঝলো এদের সাথে টিকে থাকতে আরও সৈন্য এবং আরও অস্ত্র দরকার। সেই মোতাবেক আরও অস্ত্র এলো। এলো সুশিক্ষিত পাঁচশত তীরন্দাজ।

এবারে ইমাম বাহিনীর প্রতি বৃষ্টির মতো ছুটে আসতে লাগলো বিষাক্ত তীরের ঝাঁক। একটার পর একটা ঘোড়া লুটিয়ে পড়তে লাগলো সেই বিষাক্ত তীরের আঘাতে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ইমাম বাহিনীর ৩২ জন অশ্বারোহী সৈন্য পদাতিকের কাতারে নেমে এলো। ওরা সুযোগ মতো অনেক ঘোড়াকে তলোয়ারের আঘাতে হত্যা করে ফেললো। আইউব ইবনে মাশরাহ তীরের আঘাতে হোর ইবনে ইয়াজিদ এর ঘোড়াকে মারাত্মকভাবে আহত করে ফেললো। হোর লাফ দিয়ে

ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমেই শার্দুলের মতো হুঙ্কার দিয়ে শত্রুর বেষ্টনীতে ঢুকে তীব্র বেগে তলোয়ার ঘুরাতে শুরু করলেন এবং চিৎকার করে বলতে লাগলেন, 'আমার ঘোড়াকে অকেজো করেছো, তাতে কি হয়েছে? আমিতো বীরের সন্তান। সিংহের চেয়েও আমি ভয়ঙ্কর।'

সত্যিই তিনি ভয়ঙ্কর হয়ে উঠলেন। তাঁর তরবারীর আঘাতে ছিন্নমূল বৃক্ষের মতো শত্রু সৈন্য লুটিয়ে পড়তে লাগলো জমিনে। হোর যেদিকে আক্রমণ চালান, সেদিক থেকে তারা ছিটকে দূরে সরে যেতে থাকে।

ওমর ইবনে সা'আদ বুঝতে পারলো এভাবে যুদ্ধ চলতে থাকলে ইমাম বাহিনীকে কিছুতেই পরাজিত করা সম্ভব হবে না। কারণ, ইমাম বাহিনীর তাঁবুগুলি এক স্থানে সন্নিবেশিত থাকায় এবং একযোগে আক্রমণ প্রতিহত করায় ইয়াজিদ বাহিনী সুবিধা করে উঠতে পারছিলো না। তাছাড়া আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দা, রসুল স. এর ফরজন্দ হজরত ইমাম হোসেন রা. এর পক্ষে যুদ্ধ করে শহীদ হওয়ার যে গৌরব তা থেকে কেউ বঞ্চিত হতে চায়নি। তাই ইমাম বাহিনীর সৈন্যদের মধ্যে যে উন্মাদনা কাজ করছে, তার কিছুমাত্রও ইয়াজিদ বাহিনীর সৈন্যদের মধ্যে ছিলো না। তারা যুদ্ধের জন্যই যুদ্ধ করছে মাত্র। বিশেষ করে ওবায়দুল্লাহ্ ইবনে যেয়াদের কঠোর শাস্তির ভয়েই যুদ্ধ ক্ষেত্রে আসতে বাধ্য হয়েছে তারা। ফলে এক পক্ষের অকাতরে প্রাণদান আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের জন্য, আর অন্য পক্ষের শুধুমাত্র শাসকের হুকুম পালন।

ইমাম বাহিনী সম্মিলিতভাবে যে আক্রমণ ধারা রচনা করেছিলো তাকে ছত্রভঙ্গ করতে না পেরে ওমর ইবনে সা'আদ ইমাম বাহিনীর তাঁবুতে অগ্নিসংযোগ করতে তার সেনাবাহিনীকে নির্দেশ দিলো।

আদেশ পেয়ে ইয়াজিদ বাহিনী দলে দলে মশাল নিয়ে ইমাম শিবির আক্রমণ করলো। ইমাম বাহিনীর সৈন্যদের মধ্যে চঞ্চলতা দেখা গেলো। কিন্তু হজরত হোসেন রা. সৈন্যদের উদ্দেশ্য করে বললেন, 'ওরা শিবির জ্বালাতে চায় জ্বালাতে দাও। তোমরা বাধা দিও না। আমাদের শিবিরের পেছন দিক নিরাপদই থাকবে। ওরা চেষ্টা করেও সেদিক থেকে আক্রমণ করতে পারবে না।'

শত্রু সৈন্যের আক্রমণে ইমাম শিবিরের তাঁবুতে আগুন ধরে গেলো। দাউ দাউ করে পুড়তে লাগলো অধিকাংশ তাঁবু, কিন্তু ইমাম বাহিনী বিচলিত না হয়ে সামনের দিকে আক্রমণ আরও তীব্র থেকে তীব্রতর করে তুললো। এই সময় আকস্মিক আঘাতে আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমায়ের শাহাদাত বরণ করলেন। তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রী স্বামীর আকস্মিক মৃত্যুতে একটুও বিচলিত না হয়ে যুদ্ধ-ময়দানেই স্বামীর মৃতদেহের পাশে বসে বড় যত্নের সাথে স্বামীর পবিত্র মুখমণ্ডল থেকে রক্তমাখা ধূলো সরিয়ে দিতে দিতে উচ্চারণ করলেন, 'তোমার জন্য বেহেশত মোবারক হোক।'

পাষণ্ড শিমার মৃত স্বামীর পাশে অসহায়া নারীকে দেখে এগিয়ে এসে তরবারী দিয়ে আঘাত করলো। তিনি রক্তাক্ত দেহে স্বামীর পাশেই লুটিয়ে পড়লেন। ইমাম হোসেন রা.কে ভালোবেসে, আল্লাহ্ আর আল্লাহ্র রসুল স.কে ভালোবেসে হাসিমুখে উম্মে ওয়াহাব শাহাদাতবরণ করলেন। কারবালার ময়দান শহীদ নারীর রক্তে রঞ্জিত হয়ে গেলো।

আক্রমণ আর পাল্টা আক্রমণে উভয় পক্ষের সৈন্যরা প্রাণ ত্যাগ করতে লাগলো। তবে ইয়াজিদ বাহিনীর সৈন্যরা কোনোভাবেই ইমাম বাহিনীর রক্ষাব্যুহ ভেদ করতে পারলো না। পারলো না শিবিরে আগুন ধরিয়েও তাঁদের মনোবল ভেঙে দিতে।

কিন্তু হাজার হাজার শত্রুসৈন্যের বিরুদ্ধে মুষ্টিমেয় ক'জন সৈন্য কতোক্ষণই বা যুদ্ধ করতে পারে? তাঁর উপর মুসলিম ইবনে আউসাজা শহীদ হয়েছেন। শহীদ হয়েছেন বীরশ্রেষ্ঠ আবদুল্লাহ ইবনে ওমায়ের।

দ্রুত পরিস্থিতির অবনতি ঘটছে। এভাবে কতোক্ষণ আর শত্রুদের বাধা দিয়ে রাখা যাবে বুঝা যাচ্ছে না। এর মধ্যে আবু তামামা আমর ইবনে আবদুল্লাহ হজরত ইমাম হোসেন রা. এর কাছে রব্বুল আলামীনের দরবারে শেষ প্রার্থনার জন্য আবেদন জানালেন। তিনি বললেন, 'হজরত, শত্রু সৈন্য ক্রমেই সামনে এগিয়ে আসছে। ওদের আর কতোক্ষণ বাধা দিয়ে রাখা যাবে জানি না, তবে প্রাণ থাকতে আপনার দেহে আঘাত করতে দেবো না। কিন্তু কতোক্ষণই বা বেঁচে থাকবো বুঝতে পারছি না। তাই ইচ্ছা, যদি আল্লাহ্ রব্বুল আলামীনের দরবারে একবার প্রাণ ভরে নামাজ পড়তে পারতাম।'

হজরত ইমাম হোসেন রা. তাঁর কথা শুনে সৈন্যদের উদ্দেশ্য করে বললেন, 'ওদের বলো, আমরা একটু নামাজ পড়ে নিতে চাই।'

শত্রু পক্ষ ইমাম বাহিনীর এই আবেদনে সাড়া না দিয়ে আক্রমণ আরও তীব্রতর করে তুললো। তারা বুঝতে পেরেছিলো ইমাম বাহিনীকে এখন কোনোপ্রকার সুযোগ দেয়া যাবে না, দিলে নিজেদের অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়বে। তাই তারা সম্মিলিতভাবে প্রচণ্ড আক্রমণ শুরু করলো। ফলে এক সময় ইমাম বাহিনীর বাম বাহুর অধিনায়ক, দক্ষ কৌশলী ও নির্ভরযোগ্য যোদ্ধা বীর মুজাহিদ হাবিব ইবনে মোজাহের শাহাদাতবরণ করলেন।

ইবনে মোজাহেরের শাহাদাতে ইমাম বাহিনীর মেরুদণ্ড একরকম ভেঙেই গেলো। বিচলিত হয়ে উঠলো সৈন্যদল। হোর ইবনে ইয়াজিদ দ্রুত ছুটে গিয়ে সেই স্থান দখল করে নিয়ে শত্রু বাহিনীর মোকাবেলা করতে লাগলেন দৃঢ়ভাবে আর মুখে উচ্চারণ করতে লাগলেন, 'আমি শপথ নিয়েছি না মেরে কখনোই মরবো না। আর মরতে যদি হয় তাহলে সামনেই এগিয়ে যাবো। প্রচণ্ড আঘাতে ধ্বংস করে যাবো শত্রুদের। কোনো বাঁধাই আমাকে পেছনে হটাতে পারবে না।'

প্রচণ্ড আঘাতে শত্রু সৈন্যকে ধরাশায়ী করতে লাগলেন হোর ইবনে ইয়াযিদ। কিন্তু একা তিনি কতোটুকু কি করতে পারেন। হাজার হাজার সৈন্যের বিরুদ্ধে একা কতোক্ষণই বা যুদ্ধ করা যায়? চারিদিক থেকে বৃষ্টির মতো তীর আর বল্লম ছুটে আসতে লাগলো তাঁর দিকে। আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হয়ে একসময় তিনিও জমিনে লুটিয়ে পড়ে শাহাদাতবরণ করলেন।

যোহরের নামাজের সময় পার হতে চললো। সাথে সাথে যুদ্ধের তীব্রতাও বেড়ে যেতে লাগলো। এর মধ্যেই হজরত ইমাম হোসেন তার সঙ্গীদের নিয়ে নামাজ আদায় করলেন। রক্তমাখা জমিনে মাথা নত করে আল্লাহ্ রব্বুল আলামীনের দরবারে জানালেন শেষ প্রার্থনা। তারপর শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন ময়দানে। যোহায়ের এই সময় উত্তেজনায় টগবগ করে ছুটছিলেন। তিনি একবার ঘোড়া ছুটিয়ে শত্রুর ব্যুহ ভেদ করে ভেতরে ঢুকে পড়েন এবং তরবারী চালিয়ে ধরাশায়ী করতে থাকেন একের পর এক শত্রু সৈন্য, তারপর আবার ছুটে আসেন শিবিরের কাছে। হজরত ইমাম হোসেনের রা. কাছে এসে তার পবিত্র বাহুতে চাপড় দিয়ে কবিতা আবৃত্তি করেনঃ

'আমি কাইয়েনের পুত্র যোহায়ের। আমি আমার তরবারীর তীক্ষ্ণ আঘাতে শত্রুকে আপনার নিকট থেকে দূরে থাকতে বাধ্য করবো।

চলুন। সামনে চলুন। আল্লাহ্ আপনাকে সৎপথ দেখিয়েছেন। আজ আপনার নানাজীর সাথে আপনার দেখা হবে। দেখা হবে হাসানের সাথে। দেখা হবে আলী মোরতজার সাথে। দেখা হবে বীর কেশরী জাফর তাইয়ার সাথে। দেখা হবে জিন্দা শহীদ সিংহপুরুষ হামজার সাথে।'

আবৃত্তি শেষ করে আবার তিনি ছুটে যান যুদ্ধের ময়দানে। তরবারীর আঘাতে প্রতিহত করেন শত্রু সৈন্যদের। কিন্তু কতোক্ষণ? কতোক্ষণ হাজার হাজার সৈন্যের বিরুদ্ধে একজন, শুধুমাত্র একজন মানুষ– সে যতোবড়ই যোদ্ধা হোন না কেনো? কোন পথ সে রুদ্ধ করবে? সম্মিলিত আক্রমণ ধারা রচনা করার মতো যারা ছিলো, তারা– সেই বীরবাহু হোর, আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমায়ের– তারাতো নেই। সবাই শাহাদাতবরণ করেছেন। বিচ্ছিন্নভাবে এখন এক একজন ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ছেন, দু'চারজন শত্রু সৈন্য হত্যা করছেন, তারপর শত্রুর শরাঘাতে ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে ভূমিতে লুটিয়ে পড়ছেন। প্রাণ দিচ্ছেন অসহায়ভাবে।

যদি ইমামবাহিনী সংখ্যায় এবং অস্ত্র-শস্ত্রে শত্রু সৈন্যের চারভাগের একভাগও হতেন, তাহলে এভাবে কাউকেই বুকের রক্ত ঢেলে অসহায়ভাবে শহীদ হতে হতো না।

যোহায়ের ইবনে কাইয়েন এমনি করেই অসহায়ভাবে প্রাণ দিলেন শত্রুর হাতে।

শুধু কাইয়েনের পুত্র যোহায়ের তো নয়, এরপর ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়েছে গাফফারী বংশের শ্রেষ্ঠ সন্তানেরা। মহাবীর আলীর বংশধরকে রক্ষা করাইতো বড় কথা নয়, তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করাওতো আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রসুলের প্রতি অনুগত থাকারই শামিল। হোকনা শত্রু কয়েক হাজার, হোকনা শত্রু অসমক্ষমতাশালী, কিন্তু তারাতো আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রসুলের প্রতি ন্যায়নিষ্ঠ নয়। তাহলে আর ভয় কেনো? হে সত্য অনুসারীর দল, তোমরা যতোক্ষণ জীবিত আছো, শত্রুর মোকাবেলা করো। আল্লাহ্র দরবারে গিয়ে যেনো বলতে পারো, ইয়া মাবুদ আমরা মোনফেক নই, আমরা অকৃতজ্ঞ নই। রব্বুল আলামীন, আর কেউ না দেখুক, না বুঝুক, তুমিতো সর্বজ্ঞ, তুমিতো সব কিছু দেখছো।'

একে একে শাহাদাতবরণ করলেন গাফফারী বংশের সোনার সন্তানেরা। তারপরই ছুটে এলেন জাবেরী বংশের দু'টি বালক। হীরের দ্যুতি তাদের দুই চোখে। কিন্তু মুক্তো ঝরছে সেই হীরে ভেদ করে। তপ্ত অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে কপোল বেয়ে উত্তপ্ত মরুভূমিতে।

হজরত ইমাম হোসেন এগিয়ে এলেন তাদের দিকে। স্নেহের সুরে বললেন, 'তোমরা আমার ভাই-এর ছেলে। বীর কেশরী জাবেরীর ফরজন্দ, কাঁদছো কেনো? কি হয়েছে তোমাদের?

বালক দু'টি উত্তর করলো, 'হজরত, আমরা আমাদের জন্য কাঁদছি না। এমন গৌরবের মরণ ক'জনের ভাগ্যে হয়? আমরাতো এই নিয়ামত লাভে ধন্য, গৌরবান্বিত।,

-তাহলে কাঁদছো কেনো? আর কিছুক্ষণ পরেইতো তোমাদের চোখ নিশ্চল হয়ে যাবে।'

-'আপনার জন্য হজরত। শত্রুরা আপনার চারিদিক ঘিরে ফেলেছে, অথচ আমরা অসহায়ের মতো তাই দেখছি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। কিছুই করতে পারছি না।'

কথা শেষ করতে পারলো না তারা। আবেগে উত্তেজনায় কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এলো কিন্তু সেই সঙ্গে তাদের লোনা পানিতে ভেজা চোখে আগুন বিচ্ছুরিত হতে লাগলো।

মরণ। সেতো চিরন্তন সত্য। একদিন সবাইকেই এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হবে। সবাইকে এর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। এই অসহায় বালকেরাও তা বোঝে। তাই মরণে তাদের নেই কোনো ক্ষোভ, কোনো দুঃখ। দুঃখ শুধু এই, তারা

কিশোর। যুদ্ধ সম্পর্কে অনভিজ্ঞ অসহায় কিশোর মাত্র। কিন্তু আত্মত্যাগের আকুলতা তাদের ছোট্ট হৃদয়ে বজ্রকঠোর দৃঢ়তা এনে দিয়েছে। আর তাইতো আসসালামু আলাইকুম ইয়া ইবনা রাসুলুল্লাহ্ - বলতে বলতে শত্রুর সামনে ঝাঁপিয়ে পড়েছে এবং যুদ্ধ করতে করতে কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা হাসি মুখে শাহাদাতবরণ করেছে।

হজরত ইমাম হোসেন রা. কোনো উত্তর করতে পারেননি। কোনো আশা বা আশ্বাসের বাণী তাদের শোনাতে পারেননি। চুপ চাপ দাঁড়িয়ে শত্রুর নিষ্ঠুর ধ্বংস যজ্ঞ দেখেছেন। আর রব্বুল আলামীনের দরবারে তাদের শান্তির জন্যে প্রার্থনা করেছেন। প্রার্থনা করেছেন, এই অন্যায় যুদ্ধের সমাপ্তি হোক। কিন্তু হোক বললেই তো সব কিছু হয় না। তাই একের পর এক শহীদের সংখ্যা বাড়তে লাগলো।

আস'আদের প্রিয় সন্তান হানজালা ময়দানে এসে চিৎকার করে শত্রুর উদ্দেশ্যে বললেন, 'তোমরা অন্যায়ভাবে কেনো হজরত ইমাম হোসেন রা.কে হত্যা করতে চাও? তোমাদের কি আল্লাহ্‌র গজবের ভয় নেই? তোমরা কি আদ ও সামুদের মত ধ্বংস হয়ে যেতে চাও?'

কিন্তু কার কথা কে শোনে? তাদের কানের ভিতর দিয়ে মরমে কোনো কথাই প্রবেশ করলো না।

হানযালাও শাহাদাতের অমৃত পান করে ভূতলে লুটিয়ে পড়লেন। যোদ্ধা যাঁরা ছিলেন সবাই শহীদ হয়েছেন একে একে। শহীদ হয়েছেন সাথী, বন্ধু, হিতৈষী, সবাই। সবাই মরুর তপ্ত বালিতে তাদের বুকের উষ্ণ রক্ত ঢেলে হাসিমুখে শহীদের শরাবন তহুরা পান করে রব্বুল আলামীনের সান্নিধ্যে পাড়ি জমিয়েছেন। এবারে যদি শত্রুর মোকাবেলা করতে হয় তাহলে নিজেদেরকে দাঁড়াতে হবে। আর কেউ এসে বলবে না, 'আমাকে অনুমতি দিন, কমবখতদের নিশ্চিহ্ন করার অভিযানে শরীক হয়ে ধন্য হই।'

যাঁদের কণ্ঠ ছিলো একটু আগেও মুখর, আল্লাহ্‌র জয়গানে যাঁরা ছিলেন নিবেদিত প্রাণ, এখন তাঁরা শুয়ে আছেন রক্ত ভেজা মরুর বুকে। এবার হজরত হোসেন রা. এর প্রিয় পুত্র, আলী আকবর ঝাঁপিয়ে পড়লেন ময়দানে। চিৎকার করে বললেন,' হে কাবার মালিক, তোমার কসম খেয়ে বলছি, আমরাই নবী স. এর প্রকৃত দাবীদার। অজ্ঞতাকুলশীল কোনো ব্যক্তি আমাদের আদেশ করতে পারে না। কক্ষণো না।'

বীরকেশরী আলী মুরতাজা রা. এর প্রিয় পৌত্র। হজরত হোসেন রা. এর প্রাণ প্রিয় সন্তান তরবারীর আঘাতে ধরাশায়ী করতে লাগলেন শত্রু সৈন্যদের। একজন লুটিয়ে পড়েতো পঙ্গপালের মতো দশদিক থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে একশোজন। কতোজনকে এই তরুণ তাঁর তরবারীর আঘাতে রুখে দেবে? একদিক সামাল

দিলে অন্যদিক থেকে সম্মিলিত আঘাত আসতে থাকে। এই সময় আকস্মিকভাবে মাররাহ্ ইবনে মরযম আবদীর তার তরবারী দিয়ে আঘাত করলো আলী আকবরের দেহে। প্রচণ্ড আঘাত। বাধা দেবার কোনো সুযোগ পাবার আগেই তিনি লুটিয়ে পড়লেন জমিনে।

জয়নব রা.– শেরে খোদা আলী মুরতজা'র কলিজার টুকরা, ফাতেমাতুজজোহরার হৃদয় নিংড়ানো কন্যা জয়নব ভাইপো আলী আকবরের আকস্মিক শাহাদাতে চরমভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়লেন। তিনি ছুটে এসে চিৎকার করে কেঁদে উঠলেন। হজরত হোসেন থমকে গেলেন বোনের এহেন অবস্থা দেখে।

না। বিচলিত হলে চলবে না। সত্যের জন্য প্রাণ দিবো– এইতো আমাদের প্রতিজ্ঞা। মাথানত করবো না এমন মানুষের কাছে, যার নিজেরই কোনো সঠিক ইতিহাস নেই। না– কখনোই তার আনুগত্য মেনে নেয়া যায় না। আর মেনে নেয়া যায় না বলেই এখন সামনে নিশ্চিত মৃত্যু। মরণের পেয়ালায় ঠোঁট ডুবিয়ে বসে আছিতো অনেক আগেই। এখন আর পিছিয়ে গিয়ে নিজেকে এবং নবীর বংশকে কলঙ্কিত করতে পারবো না। শত্রুরা বোনের কান্না দেখে ভাববে আমরা তাদের করুণা ভিক্ষা করতে শুরু করে দিয়েছি।

-'না, না, এখন কান্না নয়। এসো তাঁবুর ভিতরে এসো জয়নব।'

হজরত হোসেন বোন জয়নব রা.কে ধরে তাঁবুর ভিতরে নিয়ে গেলেন। তারপর ধীর পদক্ষেপে সন্তানের মৃতদেহের সামনে এসে দাঁড়ালেন। একতাল সোনা যেনো ধূলোয় পড়ে আছে। তবুও মনে হচ্ছে চাঁদের প্রাণ পাগল করা হাসি তার শহিদী ঠোঁটে ঝলসাচ্ছে। চুপি চুপি যেনো সে তার বাবাকে ডেকে বলছে আব্বা আমাকে নাও, আমাকে তোমার কাছে নাও। এইতো আমি ঘুমিয়েছি। অনন্তকাল ধরে ঘুমাবো। আর কেউ কোনোদিন আমাকে তোমার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারবে না।

হজরত ইমাম হোসেন বিচলিত হলেন না সন্তানের এই করুণ পরিণতি দেখে। তিনি হাঁটুগেড়ে সন্তানের লাশ পরম যত্নের সাথে বুকে ঝড়িয়ে ধরে তাঁবুর কাছে নিয়ে এসে শুইয়ে দিলেন। পবিত্র হাত দিয়ে মুখের ধূলো বালি সরিয়ে দিলেন। মুখে চোখে কি স্বর্গীয় আলোর বিচ্ছুরণ। এক্ষুণি হয়তো ডেকে উঠবে আব্বা বলে। এক্ষুণি হয়তো আবার অস্ত্র হাতে ছুটে যাবে যুদ্ধ ময়দানে। তারপর আবার শত্রুর মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়বে। নিশ্চিহ্ন করতে থাকবে একের পর এক শত্রু সৈন্য।

মুহূর্তের জন্য নিজের মাঝেই নিজে হারিয়ে গিয়েছিলেন হজরত হোসেন রা.। হঠাৎ একটা আর্তচিৎকারে সম্বিত ফিরে পেয়ে দেখেন তার প্রাণের চাইতেও প্রিয় বড় ভাই হজরত হাসানের যোগ্য উত্তরাধীকারী হজরত আবুল কাসেম ভূতলে গড়িয়ে পড়ে চিৎকার করছে। চাঁদের মতো উজ্জ্বল পবিত্র মুখমণ্ডল রক্তে রঞ্জিত

হয়ে গেছে। কাঁচা সোনার মতো দেহে তীক্ষ্ণ তরবারীর নিষ্ঠুর আঘাত। ঝর্ণাধারার মতো রক্ত ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ছে তৃষিত বালুকণার বুকে।

আমর ইবনে সা'আদ ইবদীর প্রচণ্ড আঘাতে আবুল কাসেম মারাত্মকভাবে জখম হতেই হজরত ইমাম হোসেন রা. তার পাশে ছুটে এলেন এবং ঘাতক আমর ইবনে সা'আদ ইবদীকে লক্ষ্য করে তলোয়ার চালালেন। জুলফিকারের প্রচণ্ড আঘাতে ইবদীর একটা হাত কনুই থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো। ইবদীর মরণ চিৎকারে চারদিক থেকে শত্রু সৈন্য ছুটে এসে তাকে রক্ষা করতে চেষ্টা করলো, কিন্তু পারলো না। পাষণ্ড ইবদী তাদের সৈন্যদের পায়ের চাপেই শেষ হয়ে গেলো। হজরত ইমাম হোসেন জুলফিকারের আঘাতে তৃণখণ্ডের মতো সবাই চারদিকে ছিটকে পড়তে লাগলো। প্রাণ রক্ষার জন্য যে যেদিকে পারলো ছুটে পালাতে গিয়ে নিজেদের আঘাতেই নিজেরা আহত হতে লাগলো একের পর এক।

হজরত ইমাম হোসেন রা. মারাত্মকভাবে আহত আবুল কাশেমের সামনে এসে দাঁড়ালেন। তারপর ঝুঁকে পড়ে মৃদু কণ্ঠে বললেন, 'আহা, এমন করে কে তোমাকে আঘাত করেছে? সেই পাষণ্ডকে আল্লাহ্ ধ্বংস করুন। নানাজীর কাছে তার কি জবাব দেবার আছে? তুমি তোমার চাচাজীর সাহায্য চেয়ে চিৎকার করেছিলে কিন্তু আমি পারিনি। তোমার কোনো সাহায্যেই আমি এগিয়ে আসতে পারিনি। এ জ্বালা যে কতো তীব্র, কতো মর্মান্তিক, কতো বেদনাদায়ক, তা কেউ বুঝবে না।'

হজরত ইমাম হোসেনের কণ্ঠস্বর ভারী হয়ে এলো। কণ্ঠ ভেদ করে শেরে খোদার সেই হায়দরী হাঁক বের হয়ে আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত করে দিতে চাইলো। কিন্তু তিনি প্রাণপণে নিজেকে সংযত রেখে পুনরায় বলতে লাগলেন, 'বাবা আমার, আমি তো আজ শত্রু দ্বারা পরিবেষ্টিত। বন্ধু যারা ছিলেন, তারা একে একে সবাই শহীদ হয়েছেন। এখন চারিদিকে শত্রু আর শত্রু। তারা আমাদের সবাইকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে বদ্ধপরিকর।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই হজরত আবুল কাশেম শাহাদাতবরণ করলেন। হজরত হোসেন রা. তাকে পরম যত্নে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরে টেনে নিয়ে এসে আলী আকবরের পাশে শুইয়ে দিলেন। তাঁবুর ভিতরে নতুন করে কান্নার রোল উঠলো। আকাশে বাতাসে সেই কান্না ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। কিন্তু শত্রু সৈন্য তাতে একটুও বিচলিত হলো না। ওরাতো এটাই চায়। কাঁদুক তাদের প্রিয় ইমাম তার পুত্র পরিজনদের জন্যে। আরতো কান্নার সময় হবে না। একে একেতো সব শেষই হয়ে এসেছে। তারপর কেউ আর কারো জন্যে কাঁদবে না। কাঁদবার জন্য কেউ থাকবেও না। কিন্তু বোকারা জানে না পৃথিবী যতোদিন থাকবে, আকাশে চন্দ্র সূর্য যতোদিন আলো বিকিরণ করবে, ততোদিন কোটি কোটি মানুষের অন্তরের অন্তঃস্থলে

প্রবাহিত হতে থাকবে শোকের অন্তহীন নদী। বুক থেকে বুকে, সেই নদীর স্রোতধারা নিরন্তর প্রবাহিত হতে থাকবে। কটা ফোরাত পারবে তার সাথে? সাগরের তো সীমা আছে কিন্তু হৃদয়ের সীমা কোথায়?

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন হজরত ইমাম হোসেন রা.। এবার তাঁর পালা। একে একে সবাই শাহাদাতের অমীয় বারি পান করে চিরশান্তির দেশে পাড়ি জমিয়েছে। এবার শত্রুর মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে প্রিয় নবী মুহাম্মদ মুস্তফা স. এর ফরজন্দ, খাতুনে জান্নাত হজরত ফাতেমাতুজ জোহরার রা. প্রাণপ্রিয় সন্তান, শেরে খোদা হজরত আলী করমুল্লাহুর রক্তের প্রতীক হজরত ইমাম হোসেন রা.কে।

বুক ভেঙে কি কান্না আসছে? আকাশ জুড়ে কি মাতম উঠছে? বাতাসে কি সর্বহারার হাহাকার ধ্বনি দিক হতে দিগন্তে ছুটেছে? পাহাড়ে পর্বতে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে কি অসহায় মায়েদের, স্ত্রীদের আর বোনদের করুণ বিলাপ?

করো, বিলাপ করো। বিলাপ করো হে খজ্জুর বিথী, তোমার চিরল পাতার শাখা দুলিয়ে। বিলাপ করো হে অসহায় ফোরাত, তোমার স্রোত ধারার কুলু কুলু ধ্বনীর হৃদয় বিদারক সঙ্গীতে, বিলাপ করো হে আকাশ, হে বাতাস, হে মরুভূমির লু-হাওয়া।

তোমরা হারিয়েছো অনেক বেহেশতী বীর পুরুষদেরকে। আর এখন হারাতে চলেছো ইসলামের শ্রেষ্ঠ মানবের দৌহিত্রকে।

ইমাম হোসেন রা. জুলফিকার দৃঢ় মুষ্টিবদ্ধ করে ময়দানের দিকে এগিয়ে চলেছেন। তার প্রিয় দুলদুলে লাফিয়ে উঠার প্রস্তুতি নিতেই হজরত জয়নব রা. ছুটে এলেন হজরত হোসেন রা. এর শিশুপুত্র আসগরকে বুকে চেপে ধরে। আকুল কণ্ঠে ভাই এর উদ্দেশ্যে প্রার্থনা জানালেন এক ফোঁটা পানির জন্যে।

আড়াই বছরের শিশু। চারদিন পানির দেখা পায়নি। মার বুকে নেই একফোঁটা দুধ। পানির অভাবে বুক শুকিয়ে সমান হয়ে গেছে অনেক আগেই। জিহ্বায় নেই এক ফোঁটা রস। প্রচণ্ড উত্তাপে চামড়ার মতো খসখসে হয়ে উঠেছে কণ্ঠ তালু। গলার স্বর গেছে বন্ধ হয়ে। চিৎকার করে কাঁদবার শক্তিটুকুও নিঃশেষ হয়ে গেছে একেবারে।

-'ভাইজান। একটু পানি। এক আঁজলা পানি। নইলে ওকে আর বাঁচানো যাবে না।' কান্নায় ভেঙে পড়লেন জয়নব ভাই এর দিকে শিশু আসগরকে বাড়িয়ে দিয়ে।

-পানি। আহ্! পানি। কোথায় পানি? কোথায় পাবো পানি? ওই যে ফোরাতের তীর, ওর কাছে যাবারতো আমাদের কোনো উপায় নেই। হাজার হাজার সৈন্য দাঁড়িয়ে আছে শুধু আমাদেরকে পানি দেবে না বলেই।

অসহায়ভাবে বোনের দিকে তাকালেন হজরত হোসেন রা.। কি করবেন বুঝতে পারলেন না। জয়নব মৃত্যুপথযাত্রী শিশুকে আবারও সামনে বাড়িয়ে দিয়ে

বললেন, 'ভাইজান, আমরা শত্রু হতে পারি। কিন্তু এই শিশুতো কারো শত্রু নয়। এর জন্যও কি ওরা এক ফোঁটা পানি দেবে না? আপনি ওকে নিয়ে যান। ভাইজান...

হজরত ইমাম হোসেন রা. বোনের মুখের দিকে তাকিয়ে আর কোনো কথাই বলতে পারলেন না। তিনিতো জানেন, ইয়াজিদের সৈন্যদের পাষাণ হৃদয় কখনোই গলবে না। তবু তিনি বোনকে আর দুঃখ দিতে চাইলেন না। শিশু আসগরকে বুকে জড়িয়ে নিয়ে শত্রু সৈন্যের দিকে এগিয়ে চললেন।

হঠাৎ একটা তীর এসে আসগর এর বুক ভেদ করে বের হয়ে গেলো। শিশু আসগর চিৎকার করবার সুযোগটুকুও পেলো না। একটু কেঁপে উঠেই স্থির হয়ে গেলো চিরদিনের জন্য। রক্তে ভেসে গেলো হজরত হোসেন রা. এর পবিত্র বক্ষ।

তীর বিদ্ধ আসগরকে ফিরিয়ে এনে পরম যত্নের সাথে হজরত হোসেন রা. তার প্রিয় সন্তানদের পাশে শুইয়ে দিলেন।

তাঁবুর পাশে চিরঘুমে ঘুমিয়ে আছে তাঁর আদরের ভাই আব্বাস, আবদুল্লাহ, ওসমান, মোহাম্মদ, ঘুমিয়ে আছে ভাইপো কাসেম, ঘুমিয়ে আছে আলী আকবর, আলী আসগর।

উত্তাল হয়ে উঠলো বুকের ভিতরটা। এক ফোঁটা পানির জন্যে আড়াই বছরের অসহায় শিশুও রেহাই পেলো না জালিমদের বিষাক্ত তীরের আঘাত থেকে।

কান্নায় কণ্ঠ বুঁজে আসতে চাইলো হজরতের। কি করবেন স্থির করতে পারলেন না। ঠিক এই সময় তাঁবুতে তাঁর আরও একটি পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করলো। নবজাতককে কোলে করে হজরতের রা. নিকট নিয়ে আসা হলো। তিনি অতি সাবধানে সন্তানকে বুকের সাথে মিশিয়ে নিয়ে শিশুর কানে আজান দিতে লাগলেন। এই সময় ইয়াজিদের এক নরাধম সৈন্য তীর ছুঁড়ে মারলো। তীর সদ্যজাত শিশুর কণ্ঠনালী ভেদ করে গেলো। সাথে সাথেই চির ঘুমে ঢলে পড়লো সে। হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন হজরত হোসেন। কিন্তু তবুও কাউকে অভিশাপ দিলেন না। তিনি পরম যত্নে তীরটি কণ্ঠনালী থেকে টেনে বের করলেন। ফিনকী দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এলো আহত স্থান থেকে। তিনি আঁজলা ভরে সেই রক্ত নিয়ে ওই শিশুর শরীরেই মাখিয়ে দিতে দিতে বললেন, 'আল্লাহ্‌র কসম, তুমি আল্লাহ্‌র কাছে হজরত সালেহ্ আ. এর উটনীর চাইতেও প্রিয় এবং হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মুজতবা স. আল্লাহ্‌র কাছে সালেহ আ. এর চাইতেও শ্রেষ্ঠ। হে আল্লাহ্ রহমানুর রহিম, তুমি যদি আমার জন্যে তোমার সাহায্যের দরোজা বন্ধ করে দিয়ে থাকো, তবে তোমার যা ইচ্ছা তাই করো। তোমার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা, আমার জীবন।'

তারপর শিশুকে আসগর ও অন্যান্য শহীদদের পাশে শুইয়ে দিলেন। এই সময়ে শত্রু সৈন্য ধীরে ধীরে হজরত ইমাম হোসেন রা.কে ঘিরে ফেলতে লাগলো। শিমার চিৎকার করে তার সৈন্যদেরকে উত্তেজিত করে তুলতে লাগলো হজরত হোসেনকে আক্রমণ করার জন্য। কিন্তু কোনো সৈন্যই এগিয়ে আসতে সাহস পেলো না। ধীরে ধীরে বেষ্টনী ছোট হয়ে আসছে অথচ আঘাত আসছে না কোনো দিক থেকেই।

মানব শ্রেষ্ঠ হজরত মোহাম্মদ স. এর দৌহিত্রের প্রতি সবার আগে তীর, বর্শা নিক্ষেপ করে পাপের ভাগীদার হতে কেউ রাজি নয়। সবাই চাইছে অন্য কেউ আগে আঘাত করুক। আঘাত করুক এই পবিত্র দেহে যেখানে হজরত মোহাম্মদ স. এর পবিত্র হাতের পরশ রয়েছে। রয়েছে চুম্বনের পরশ, মুখে, গলায়, ঠোঁটে।

হজরত হোসেন রা. শত্রুকে আক্রমণ ধারা রচনা করতে দেখেও বিচলিত হলেন না। জয় পরাজয় তো নির্ধারিত হয়েই আছে। এখন শুধু অপেক্ষার পালা। কখোন শত্রুর আঘাতে তিনি শাহাদাতবরণ করে নানাজীর কাছে চলে যাবেন। চলে যাবেন জগত শ্রেষ্ঠা রমণী, হজরত ফাতেমাতুজজোহরা–তার গর্ভধারিণী মায়ের কাছে।

আহ! প্রিয় মিলনের আর কতো দেরী? আশেক মাশুকের পবিত্র পথে এতো বাধা কেনো? এসো। এসো তোমরা, আমাকে আমার প্রাণপ্রিয় মাশুকের কাছে পাঠিয়ে দাও। আমি প্রস্তুত। আমি লাব্বায়েক, লাব্বায়েক বলে সেই রহমানুর রাহিমের কাছে গিয়ে দাঁড়াতে চাই।

শত্রু সৈন্য ধীরে ধীরে তাদের বেষ্টনীর পরিধি কমিয়ে আনতে লাগলো। যে কোনো সময় আক্রমণ শুরু হয়ে যেতে পারে। ইয়াজিদের সৈন্যরা একে অপরকে উত্তেজিত করতে চেষ্টা করছে। হানো, আঘাত হানো। কে আছো এগিয়ে এসো। এগিয়ে এসে তরবারীর আঘাতে তাকে ধ্বংস করে দাও। হজরতের রা. এই অবস্থা লক্ষ্য করে হঠাৎ তাঁবুর একটা খুঁটি নিয়ে ছুটে এলো এক কিশোর। চিৎকার করে ইয়াজিদ সৈন্যদের উদ্দেশ্য করে বললো, 'খবরদার আমার চাচাজীকে হত্যা করলে ফল কখনো ভালো হবে না।

আল্লাহর বাণী, রসুলের উপদেশ যাঁরা শোনেনি তারা এক অসহায় কিশোরের কথা শুনবে কেনো? বাহার ইবনে কো'আব নামে এক ইয়াজিদ সৈন্য তার মস্তক লক্ষ্য করে প্রচণ্ড বেগে আঘাত করলো। কিশোর দু'হাত পেতে সেই আঘাত গ্রহণ করলো। তীক্ষ্ণ তরবারীর আঘাতে হাত দু'টো দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একটুখানি চামড়ার সাথে ঝুলে রইলো। মরণ চিৎকার দিয়ে উঠলো কিশোর। হজরত ইমাম হোসেন রা. তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। রক্তে ভেসে গেলো নিজের বক্ষস্থল। অস্ফুট কণ্ঠে কিশোরকে বললেন, একটু ধৈর্য ধরো বাবা, আল্লাহ্ ধৈর্যশীল বান্দাকে ভালোবাসেন। একটু পরেই তুমি তোমার পুণ্যবান গুরুজনদের সাথে মিলিত হতে পারবে। মিলিত হতে পারবে রসুলুল্লাহ্ স., হজরত আলী, হামজা, জাফর এবং হজরত হাসানের সাথে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই কিশোরের চোখ চিরদিনের জন্যে বন্ধ হয়ে গেলো। একেও হজরত ইমাম হোসেন রা. নিজ সন্তানদের পাশে শুইয়ে দিলেন। তারপর আর অপেক্ষা না করে আল্লাহ্র নাম নিয়ে শত্রুর উদ্দেশ্যে দুলদুলকে ছুটিয়ে দিলেন।

এই সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিলো ইয়াজিদের সৈন্যদল। চারিদিক থেকে মুহূর্তের মধ্যে হজরত ইমাম হোসেনকে ঘিরে আক্রমণ করতে উদ্যত হলো। কিন্তু একেবারে কাছাকাছি এসেও তাঁকে আঘাত করতে সাহস পেলো না। এই পবিত্র দেহে কে প্রথম তরবারীর আঘাত হানবে তা স্থির করতে পারলো না কেউ।

হজরত বিদ্যুত গতিতে চতুর্দিকে তাঁর জুলফিকার ঘুরিয়ে চললেন। যারা সামনে পড়লো তারা কচুঁকাটা হয়ে লুটিয়ে পড়লো জমিনে। আর যারা সামনে পড়লো না তারা ভীরু মেষ শাবকের মতো ছুটে পালাতে লাগলো দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে।

ক্ষুধায়, তৃষ্ণায়, প্রিয়জনের বিয়োগ ব্যথায় অবসন্ন বিধ্বস্ত হজরত ইমাম হোসেন রা. সিংহের মতো ঘুরে ঘুরে আক্রমণ করতে লাগলেন। তার দৃঢ়চিত্ততা ইয়াজিদ সৈন্যদের মনে ভীতির সঞ্চার করলো। কি করবে বুঝতে না পেরে হতবুদ্ধি হয়ে গেলো তারা।

এ কোন মানুষ ইনি। একি ফেরেশতা না কি অন্য কিছু? যার সমস্ত পরিবার পরিজন, আত্মীয় স্বজন চোখের সামনে একে একে একে শাহাদাতবরণ করেছে তার পক্ষে এমন বীর বিক্রমে যুদ্ধ করা কি করে সম্ভব?

সময় গড়িয়ে চললো। হজরত হোসেন রা. যে দিকে তরবারী চালান সেই দিকের পথ পরিষ্কার হয়ে যায়। বাকি তিন দিক থেকে তারা আবার আক্রমণ চালায়। আবার তিনি পিছন ঘুরে যখন আক্রমণ চালান, সে দিকেও শত্রু মুক্ত হতে বেশী সময় লাগে না। এভাবেই হজরত কিছুক্ষণের মধ্যেই ফোরাতের তীর মুক্ত করে ফেললেন।

আহ্ এইতো সেই পানি। এইতো সেই প্রাণ রক্ষাকারী শরাবন তহুরা। কেমন সুন্দর কুল কুল রবে বয়ে চলেছে আপন মনে। এই পানির এক কাতরা পাবার জন্য কতো শিশু-কিশোর যুবক-বৃদ্ধ অকাতরে প্রাণ বিলিয়ে দিয়েছে। তাদের বুকের যতো রক্ত ঝরেছে তাতে আর একটা ফোরাত জন্ম নিতে পারতো। সেই পানি। টলটলে আয়নার মত পরিষ্কার সেই পানি এখন তাঁর নাগালের মধ্যে, হাত বাড়ালেই এই জীবন সুধার স্পর্শ পাওয়া যায়। কিন্তু না। হজরত ইমাম হোসেন রা. থমকে গেলেন। এই পানিতে তাঁরতো আর কোনো অধিকার নেই। কার জন্য, কিসের জন্যে আর পানি তিনি নেবেন? নিজের জন্যে? কি হবে? সবতো শেষ হয়ে গেছে।

পানি পানি করে প্রাণ দিয়েছে আসগর। প্রাণ দিয়েছে সদ্য জাত শিশু। না-না। এই পানি আর দরকার নেই তার। ফোরাতের তীর থেকে তিনি ফিরে চললেন।

এই সময় পেছন থেকে হজরতের কাছাকাছি এসে পড়লো ইয়াজিদের সেনাপতি ওমর ইবনে সা'আদ। হজরত জয়নব ভাই এর এই অবস্থা দেখে তাঁবুর মধ্যে আর স্থির থাকতে পারলেন না। তাঁর নারী হৃদয় ভেঙে গুড়িয়ে যেতে লাগলো। কান্নায় ভেঙে পড়লেন তিনি। ওমরকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'হে ওমর, তোমারই সামনে আবু আবদুল্লাহকে প্রাণ দিতে হবে?'

চোখের পানিতে ওমর ইবনে সা'আদ এর গণ্ডদেশ প্লাবিত হয়ে গেলো। তার দাড়ি বেয়ে টপটপ করে ভূমিতে গড়িয়ে পড়ছিলো অশ্রু। সে জয়নবের এই আকুলতা সইতে না পেরে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলো।

হজরত জয়নবের এই আকুলতা হজরত ইমাম হোসেন রা. কে এবারো বিচলিত করে তুললো। তিনি তাকে কিছু বলতে চাইলেন কিন্তু পারলেন না। পিপাসা কাতর কণ্ঠে পরিষ্কার কোনো শব্দ উচ্চারিত হলো না। ঠিক এই সময় একটা তীর এসে হজরত হোসেনের কণ্ঠনালিতে বিদ্ধ হলো। তিনি দুলদুল থেকে জমিনে গড়িয়ে পড়লেন।

হায় আকাশ! তুমি এখনও স্থির আছো? তোমার সমস্ত সীমানা জুড়ে এতো কোটি কোটি গ্রহ-নক্ষত্র বিরাজমান, তারা কি এখনও আপন কক্ষপথে পরিভ্রমণে রত? হে বাতাস, তুমি এখনও স্বাভাবিক গতিতে বয়ে চলেছো? ঝড় হয়ে, ঘূর্ণি হয়ে এই কারবালা প্রান্তর মানবের দৃষ্টি থেকে নিশ্চিহ্ন করবে কখোন?

হে সূর্য, তুমি কি তোমার সর্বগ্রাসী অনলে সবকিছু পুড়িয়ে ছারখার করে দিতে পারো না? আজ বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষটির সব চাইতে প্রিয় দৌহিত্রের প্রতি যে, অবিচার, অত্যাচার আর অন্যায় আচরণ করা হচ্ছে, তুমি কি তাদের তোমার

অনলে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারো না? পারোনা কি কারবালার বুকের এই অসহনীয় ঘটনাকে পৃথিবী থেকে চিরদিনের জন্যে মুছে দিতে?

হজরত ইমাম হোসেন রা. নিজেই নিজ কণ্ঠনালী থেকে তীরটি টেনে বের করলেন। গলগল করে বেরিয়ে এলো তাজা খুন। হজরত হাত পেতে সেই টকটকে লাল রক্ত চোখের সামনে তুলে ধরলেন। এক জান্নাতি নূরে তাঁর পবিত্র চেহারা উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। পরম তৃপ্তিতে চোখ দু'টো হয়ে উঠলো অশ্রুসজল। প্রিয় মিলনের আবেগে কণ্ঠ হয়ে উঠলো প্রাণময় সতেজ।

আঁজলা ভরা রক্ত সেই রহমানুর রহিমের উদ্দেশ্যে তুলে ধরে তিনি তার শোকর গোজারী করলেন। বললেন, 'হে খোদা, আমার ফরিয়াদ একমাত্র তোমারই দরবারে। আর অন্য কোথাও নয়। তুমি দেখো, তোমার প্রিয় দোস্ত, তোমার রসুলের ফরজন্দ এর প্রতি কি ব্যবহার করা হচ্ছে।'

শিবির থেকে নারী ও শিশুদের কান্না ভেসে এলো। হজরত হোসেন রা. বিচলিত হয়ে উঠলেন। শত্রুরা তাঁকে হত্যা করে বুঝি তৃপ্তি পাবে না। তাঁবু লুট করে, মেয়েদের অসম্মান করে তাদের লালসাকে চরিতার্থ করতে চাইবে। তাই তিনি সেই দিকে ফিরে যেতে লাগলেন কিন্তু পারলেন না।

শিমারের বাহিনী তাঁকে ঘিরে রাখলো। হজরত বুঝতে পারলেন তাঁকে আর তাঁর প্রিয়জনদের কাছেও ফিরে যেতে দেয়া হবে না। মরবার সময় তাদের কারো স্নেহস্পর্শও তিনি পাবেন না। পাবেন না স্ত্রীর সেবা, বোনের আদর, সন্তানের সাহচর্য।

তীরের আঘাতে কণ্ঠনালী ফুটো হয়ে রক্তের নদী বুক ভাসিয়ে নীচে গড়িয়ে পড়ছে। আগুন ধরে গেছে শিরা উপশিরায়। দৃষ্টিশক্তি ঝাপসা হয়ে আসছে ক্রমেই। দাঁড়িয়ে থাকতে আর তিনি পারছেন না। পায়ের তলায় বিশাল প্রান্তর উত্তাল সমুদ্রের বুকে ভাসমান তরীর মত টলমল করছে। স্থির থাকতে পারছেন না কোনোভাবেই। মনে হচ্ছে এই বুঝি পড়ে যাবেন তিনি।

স্মৃতিশক্তি হারিয়ে যাবার আগেই তিনি শিমারকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'হে শিমার, তোমাদের যদি দ্বীন ধর্ম না থাকে, পরকালের বিচারের ভয় না থাকে, তাতে আমার কিছুই বলার নেই। কিন্তু সাধারণ ভদ্রতাটুকু বিসর্জন দিও না। অসভ্য ও বর্বর সৈন্যদের হাত থেকে আমার তাঁবুটি অন্ততঃ রক্ষা করো।'

শিমারের পাথর হৃদয়ে চিড় ধরলো বোধ হয়। ইমাম হোসেন রা. আর বেশীক্ষণ বাঁচবেন না তা সে বুঝতে পারলো। যা সে চেয়েছিল তা সে পেয়েছে কি? কি পেয়েছে? ওবায়দুল্লাহ বিন যেয়াদের অনুকম্পা এবং তার পুরস্কার স্বরূপ

রাজ দরবারে বড় কোনো পদ? নাকি শুধু প্রতিশোধ আকাঙ্খাই এই মহান ব্যক্তির ধ্বংস সে কামনা করেছে?

যাই তার মনে থেকে থাকুক। হজরত ইমাম হোসেনের শেষ আবেদন সে উপেক্ষা করতে পারলো না। মৃদুস্বরে প্রতিউত্তর করলো, 'তাই হবে। আপনার তাঁবুর উপরে কোনো আক্রমণ করা হবে না।'

এই আশ্বাসটুকুই হজরত চাইছিলেন। একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস তাঁর বুক ভেদ করে বের হয়ে এলো। আরতো মাবুদের কাছে চাইবার নেই কিছু। তিনিতো মহামিলনের জন্য উন্মুখ হয়েই আছেন। সময় হলেই চলে যাবেন মাবুদের দরবারে। কিন্তু তার প্রিয়তমা স্ত্রী, প্রাণপ্রিয় ভগ্নি, অসুস্থ মৃত্যুপথযাত্রী সন্তান জয়নালকে রেখে যাচ্ছেন একান্ত অসহায় অবস্থায়। আল্লাহ্ তাদের হেফাজত করেন। তিনিই সর্বজ্ঞ। তিনি যা ভালো বুঝবেন তাই করবেন। কখনোই তার প্রিয় বন্ধুদের তিনি তার স্নেহচ্ছায়া থেকে বঞ্চিত করবেন না।

রক্তের নদীর ধারা ক্ষীণ হতে ক্ষীণ হয়ে আসছে। প্রচণ্ড রৌদ্রতাপে বুকের মাঝে তা শুকিয়ে জমাট বাঁধছে। ইয়াজিদ সৈন্য হতবিহবল হয়ে তাই দেখছে। হাত তাদের আঘাতের জন্য উঠছে না। কোনো এক অদৃশ্য শক্তি যেনো প্রভাবিত করে রেখেছে তাদেরকে।

সৈন্যদের এই অবস্থা লক্ষ্য করে শিমার চিৎকার করে তাদের গালি দিতে শুরু করলো, 'তোদের সর্বনাশ হোক, তোরা এখনও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি দেখছিস। আঘাত কর। প্রচণ্ড আঘাত। শেষ করে দে। অবসান হোক এই দুঃসহ ঘটনার।

হ্যাঁ, তাই করো শিমার। তাই করো। কেনো শুধু শুধু তোমরা অপেক্ষা করছো? কেনো আমার মাশুকের সাথে মিলনের পথকে তোমরা দীর্ঘায়িত করছো? কেনো একে অপরকে উত্তেজিত করছো? এসো, এগিয়ে এসো। আমাকে আমার মাবুদের কাছে যাবার পথ করে দাও। বিশ্বাস করো। আল্লাহ্র কসম করে বলছি, আমাকে হত্যা করলে আল্লাহ্ যেমন অসন্তুষ্ট হবেন এমন আর কাউকে হত্যা করলে হবেন না। একথাতো তোমাদের অজানা নয়। তোমরাতো জেনেশুনেই এই কারবালায় আমাকে নিয়ে এসেছো। আমার পরিবার পরিজনদের হত্যা করেছো। হত্যা করেছো আমার সঙ্গী সাথীদের। আমার সহায়তাকারীদের। হত্যা করেছো অসহায় শিশু কিশোরদের।

আরতো কিছু চাইবার থাকতে পারে না তোমাদের। এখন শুধু আমি। আমিই আছি। আঘাত করো, আঘাতে আঘাতে আমাকে ছিন্নভিন্ন করে দাও। ধূলিতে মিশিয়ে দাও আমার এই অস্থায়ী দেহটাকে।

শিমার হজরতের কোনো কথাতেই কান দিলো না। সে তার সৈন্যদের অভিসম্পাত করতে লাগলো। ইমাম হত্যায় এই অহেতুক বিলম্বকে চরম শাস্তি হিসাবে গণ্য করা হবে বলে ভয় দেখাতে লাগলো।

তবুও কেউ অগ্রসর হয়ে হজরতের দেহে আঘাত করতে সাহস পেলো না। কিন্তু হঠাৎই যোরআ ইবনে শরীফ তামামী লাফিয়ে হজরত হোসেন রা. এর সামনে এগিয়ে এসে তরবারী দিয়ে তার বাম বাহুতে প্রচণ্ড আঘাত হানলো। বাহুমূল দু'ফাক হয়ে গেলো। তিনি প্রত্যাঘাত করতে পারলেন না। ডান হাতে জুলফিকার তখনও ধরা ছিলো। কিন্তু তিনি তা তুলে ধরতে পারলেন না।

কণ্ঠনালী বেয়ে রক্ততো অনেক আগেই নিঃশেষ হয়েছে। বর্শা, তীর আর তরবারীর আঘাতে আঘাতে ঝাঁজরা হয়ে গেছে পবিত্র অঙ্গ প্রত্যঙ্গ।

জ্বালা যন্ত্রণা হারিয়ে গেছে অনেক আগেই। কোনো আঘাতই এখন আর বিচলিত করতে পারছে না। ইয়াজিদ সৈন্যও কেমন যেনো ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে। এতো আঘাতের পরেও একটা মানুষ কেমন করে নিজের পায়ের উপর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। এতো ধ্বংসের বেদনা বুকে নিয়ে পাহাড়ের মতো মাথা উঁচু করে এখনও হজরত কেমন করে দাঁড়িয়ে আছেন তা কোনোভাবেই বুঝে উঠতে পারছে না তারা। ধীরে ধীরে এক অজানা আতঙ্ক তাদের শিরা-উপশিরায় প্রবাহিত হতে লাগলো। হজরত হোসেন রা.কে ছেড়ে দূরে সরে যেতে চাইলো সবাই। কিন্তু শিমার আবার তাদের সাবধান করে দিলো, হুকুমমতো কাজ না করলে সবাইকে কঠোর সাজা ভোগ করতে হবে। নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হবে তাদের পরিবার পরিজনকে। ধ্বংস করে দেয়া হবে তাদের প্রত্যেকের আবাসস্থল।

শিমারের কথায় সানান ইবনে আনাস নখফী উত্তেজিত হয়ে উঠলো। সে তার বর্শা দিয়ে হজরত ইমাম হোসেন রা. এর বুকে প্রচণ্ড বেগে আঘাত করতেই ঝড়ে উপড়ানো বট গাছের মতো তিনি জমিনে গড়িয়ে পড়লেন।

তাঁবুর ভেতরের কান্না আর যেনো তাঁর কানে এসে পৌঁছাচ্ছে না। স্ত্রী, পুত্র, বোন কারো প্রাণফাটা হাহাকার তাঁকে আর বিচলিত করতে পারছে না। তিনি জমিনে পড়ে আর উঠতে পারলেন না। পার্থিব জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন একেবারেই।

সানান ইবনে আনাস নখফী অন্য একজন সৈন্যকে হজরতের মস্তক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে বললো। কিন্তু এই নিষ্ঠুর কাজের জন্য এগিয়ে এলো না সে। তখন সানান নিজেই এগিয়ে এসে হজরতকে প্রথমে জবেহ্ করলো। তারপর দেহ থেকে পবিত্র মস্তক দ্বিখণ্ডিত করে ফেললো। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রজিউন।

হজরত ইমাম হোসেন রা. সত্য প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে শাহাদাতবরণ করলেন। নিজের পরিবারবর্গ, সঙ্গী সাথীদের সেই ন্যায়ের পথে উৎসর্গ করে দিলেন।

আকাশ বাতাস পথ প্রান্তরে, মরুভূমির বালুকা রাশি একযোগে চিৎকার করে উঠলো হায় হোসেন, হায় হোসেন বলে। পাখিদের কণ্ঠে সে বিলাপ ধ্বনি মুখরিত করে তুললো পাহাড় পর্বত, গিরি, নদী-বন। এ যেনো এক অন্তহীন বিষাদ-প্রবাহ- হায় হোসেন - হায় হোসেন।

ফোরাত নদীও বুঝি তার স্রোত ধারা হারিয়ে ক্ষণিকের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেলো। তারপর তার কুলকুল ধ্বনি হায় হোসেন, হায় হোসেন বিলাপ ধ্বনীতে রূপ নিয়ে এগিয়ে চললো সামনের দিকে।

পাখির কণ্ঠে নেই গান, মৃদুমন্দ বাতাসে নেই প্রাণচঞ্চল উন্মাদনা। সবই কেমন যেনো বিষণ্ন। অসহায়। হতবাক। অথচ ইয়াজিদ সৈন্যদের মনে আবার নতুন করে শুরু হলো উন্মাদনা। হজরতের মাথায় ছিল পাগড়ী, দেহে ছিলে লম্বা ঝুলের পোশাক। তরবারী ও বর্শার নিষ্ঠুর আঘাতে ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিলো সেই পোশাক। পাষণ্ডের দল সেই পোশাকগুলিও টেনে হিঁচড়ে খুলে নিলো।

কি নির্মম পরিহাস। হাজার হাজার মানুষের যিনি ছিলেন ইমাম। নেতা। প্রতিনিধি। আজ তিনি নগ্ন দেহে উন্মুক্ত ময়দানে অসহায়ভাবে পড়ে আছেন। ৩১টি বর্শার আর ৩৪টি তরবারীর আঘাত বুক পেতে নিয়ে হাসিমুখে যিনি মাশুকের দরবারে হাজির হতে চললেন, তিনি কোনোদিনও হয়তো ভাবেননি, শাহাদাতের পরেও তাঁর লাশ নিয়ে এই নিষ্ঠুর খেলা চলবে।

শত্রু সৈন্যরা হজরতের পোশাক ছিনিয়ে নিয়েও তৃপ্ত হতে পারলো না। ওবায়দুল্লাহ্ ইবনে যেয়াদ এর নির্দেশে ওমর ইবনে সা'আদ ঘোষণা দিলো হজরতের পবিত্র দেহকে যারা যারা ঘোড়ার পদতলে দলিত করতে চায়, তারা যেনো সামনে এসে সার বেঁধে দাঁড়ায়।

কথা শেষ করতেই দশজন অশ্বারোহী তাদের ঘোড়া নিয়ে সামনে এসে দাঁড়ালো। ওমর ইঙ্গিত করতেই পাষণ্ডের দল হজরত ইমাম হোসেন রা. এর পবিত্র দেহের উপর দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলো। গোড়ার খুরের আঘাতে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেলো সেই পবিত্র দেহের বিভিন্ন অংশ। চেনার আর উপায় রইলো না দেহের এই বিচ্ছিন্ন অংশগুলো এমন এক মহান ব্যক্তির, যাঁর জন্যে উদগ্রীব থাকতেন দ্বীনের নবী হজরত মোহাম্মদ স.।

নিষ্ঠুর পাষণ্ডের দল ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা শহীদানের মস্তকগুলো দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে যাচ্ছে বর্বর ওবায়দুল্লাহ ইবনে যেয়াদের কাছে উপঢৌকন হিসাবে হাজির করার জন্যে।

বাহাত্তরটি পবিত্র মস্তক। সত্য প্রতিষ্ঠা করতে হাসিমুখে শাহাদাত বরণ করেছেন বাহাত্তর জন। শুধু প্রাণ দেননি তারা। প্রাণও নিয়েছেন। বিরাশিজন দুশমনকে খতম করেই প্রাণ দিয়েছেন তারা। শহীদ হয়েছেন।

কাঁদো ফোরাত তুমি কাঁদো। কাঁদো তুমি অনন্ত কাল ধরে। কাঁদো ফোরাতের তীর। কাঁদো তুমি পৃথিবীর সব চাইতে মর্মান্তিক ঘটনার মর্মবিদারক স্মৃতি বুকে নিয়ে। কাঁদো তুমি তোমার বুকের বালু কণা বাতাসে উড়িয়ে উড়িয়ে।

আর এই পৃথিবী কাঁদুক কেয়ামত পর্যন্ত। লোভ, লালসা, আর স্বার্থের জন্য মানুষ যে নৃশংসতম ঘটনাও ঘটাতে পারে তার জ্বলন্ত প্রমাণ নিয়ে কাঁদুক মাটির মানুষ। মাটির বুকে মুখ লুকিয়ে কাঁদুক তারা অনন্তকাল। তাদের অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করুক হায় হোসেন, হায় হোসেন বলে বুক চাপড়িয়ে।

ফোরাতের তীরে সাঁঝ নামছে। উটের কাফেলা চলেছে কুফার উদ্দেশ্যে। কান্নার ঢেউ আকাশ বাতাস ছাপিয়ে দিক হতে দিগন্তে ছুটে চলেছে। সেই সাথে সমস্ত নিসর্গের বুক চিরে মুহুমুর্হু ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে শোকাবহ উচ্চারণ- হায় হোসেন! হায় হোসেন!

ISBN 984-70240-0039-0